গবেষণা চালিয়ে দেখেছে গণমাধ্যমের বিষয়টির গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে। ছোটবেলা থেকেই গণমাধ্যমের ব্যবহারের সঙ্গে মানুষ পরিচিত। এর মাধ্যমে জানা, শেখা ও উপভোগ করার মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

গণমাধ্যম ব্যবহারের সুফল ও কুফল দুটি দিকই হয়েছে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ যখন শিক্ষিত হয়, আলোকিত হয় তখন তাহল সুফল, আর শিশুরা যখন টেলিভিশন দেখে হিংসার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তা হল কুফল। প্রতিটি গণমাধ্যমের ব্যবহারের মধ্যেই এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে।

গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলি হল — (১) ব্যক্তিগতস্তরে ব্যবহার, (২) পারিবারিকস্তরে ব্যবহার (৩) প্রকাশ্যস্তরে ব্যবহার। মানুষ যখন শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে একেবারে নিজস্বভাবে এই গণমধ্যমকে ব্যবহার করে তখন বলা হয় ব্যক্তিগতস্তরে মাধ্যম ব্যবহার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে যখন মাধ্যমের ব্যবহার করে মানুষ তখন ঘটে পারিবারিক স্তরে ব্যবহার। আবার অনেক সময় প্রকাশ্যে মাধ্যমের ব্যবহার ঘটে। যেমন সিনেমা দেখা, অডিটোরিয়ামে গিয়ে সংগীতানুষ্ঠান শোনা ইত্যাদি।

গণমাধ্যমগুলির ব্যবহার অনুষ্ঠান করলে দেখা যায় এই তিনটি স্তর অনেক ক্ষেত্রে মিলেমিশে আছে। যেমন সংবাদপত্র ব্যক্তিগতস্তরে ব্যবহৃত হয়। তবে চরিত্রের দিক থেকে এর আবেদন বহু মানুষের কাছে একই রকম হবে এটা ধরে নেওয়া হয়। ফলে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করলেও এর আবেদনের মধ্যে এক ধরনের সার্বজনীনতা থেকে যায়। টেলিভিশন অনুষ্ঠান মানুষ পরিবারের অনেক সদস্যদের সঙ্গে দেখে। এর আবেদনও সার্বজনীন। সদস্যদের সঙ্গে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া যায়। বেতার টেলিভিশনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী। কারণ শ্রুতি মাধ্যম অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করে। কথা বা গান যে আবেদন রাখছে তা অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। সময়মতো ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। ইচ্ছেমতো বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পারে মানুষ। বই-এর ব্যবহারও অনেক বেশি ব্যক্তিগত। প্রয়োজনমতো অবকাশ অনুযায়ী বই পড়া যায়।

কম্পিউটার ও উপগ্রহ চ্যানেল মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আন্তঃক্রিয়াশীলতার সুযোগ এই মাধ্যমগুলিতে বেশি। ইন্টারনেট, সিডিরম ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারী নিজের পছন্দ মাফিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। উপগ্রহ চ্যানেলের ক্ষেত্রেও এই সুযোগ রয়েছে। ইচ্ছেমতো চ্যানেল বোতাম টিপলেই পাওয়া যায়। ব্যবহারকারী খুশীমতো মাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারে। সংবাদপত্র, বই, বেতারের ক্ষেত্রে এই মিথস্ক্রিয়তার (interaction) সুযোগ খুবই সীমিত।

তৃপ্তি ঃ

মাধ্যম ব্যবহার মানুষকে তৃপ্তি দেয়। বৈদ্যুতিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে তৃপ্তি পাবার সুযোগ বেশি। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বেতার এবং টেলিভিশন দেখে মানুষ তৃপ্তি পায়। তবে মাধ্যম অনুযায়ী তৃপ্তির রকমফের হয়ে থাকে। সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা বেশি উপলব্ধি করা যায়। সংবাদ পাঠ করে মানুষ বিভিন্ন ঘটনা, সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়। এই জানার মধ্যে আছে কৌতূহলের নিবৃত্তি, অজানাকে জানার আকুলতা। সংবাদ পাঠ করে মানুষ আরও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তৃপ্তির সম্ভাবনা এখানে খুবই কম। কিন্তু ফিচার, কলাম পাঠ করে মানুষ এক ধরনের তৃপ্তি পায়, উপভোগের আনন্দ পায়।

বেতার অনুষ্ঠান শুনেও মানুষ তৃপ্তি পায়। সংবাদপত্র পাঠ করার চেয়ে বেতার অনুষ্ঠান শোনার তৃপ্তি অনেক বেশি। গান, নাটক ও সংগীতের বিচিত্রানুষ্ঠান শুনে মানুষের মন ভরে যায়। অবকাশের সময়ে বেতার অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মানুষের মন তৃপ্ত হয়, আনন্দ-ঘন আবেশে আপ্লুত হয় হৃদয়।

টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তিবোধে আচ্ছন্ন হয় মন। সিরিয়াল, নাটক, নাচ-গানের অনুষ্ঠান

দেখতে দেখতে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তার মাত্রা সংবাদপত্র, বেতারের থেকে অনেক বেশি। মানুষের মনের ওপর টেলিভিশনের গভীর প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবের মধ্যে তৃপ্তি অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। টেলিভিশন হল প্রধানত বিনোদন মাধ্যম। যেখানে বিনোদনের সুযোগ বেশি, যেখানে তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনাও বেশি। সিনেমাও মানুষকে তৃপ্ত করে, হৃদয়, মনে তরঙ্গ ভুলে যায়। গানে, কথায়, অভিনয়ে, গল্পের বুনোটে, ক্যামেরার অভিনব ব্যবহারে এক অন্য জগতের সন্ধান পায় দর্শক। হৃদয় মন তৃপ্তিতে ভরে যায়।

Stuart Hyde গণমাধ্যম থেকে উদ্ভূত তৃপ্তির ওপর গবেষণা চালিয়ে ৩১ ধরণের তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। মোট ৪টি শ্রেণীতে তিনি এই ৩১টি তৃপ্তিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই চারটি শ্রেণী হল ঃ (১) প্রতিনিধিত্বমূলক (Vicarious), (২) পলায়নী প্রবৃত্তি (escapist), (৩) সামাজিক (Social) এবং (৪) আত্মিক ও নৈতিক (Spritual and moral)। প্রতিনিধিমূলক শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য তৃপ্তি হল নিজের মনের মতো নায়ক বা নায়িকা দেখা। পলায়ণী প্রবৃত্তির একটি তৃপ্তি হল নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া। সামাজিক তৃপ্তি হল যে কোন বিষয়ে অন্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভাগ করে নেওয়া। আত্মিক ও নৈতিক শ্রেণীর অন্যতম তৃপ্তি হল যা মন্দ তার পরাজয় এবং যা ভাল তার জয় দেখতে চাওয়া।

তৃপ্তির উৎস রয়েছে উপভোগ করার মধ্যে কীভাবে মানুষ উপভোগ করছে সেটা জানতে পারলেই জানা যাবে তৃপ্তির ধরণটি কেমন হবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক আসার আগে মানুষের মধ্যে যে ধারণা, মূল্যবোধ থাকে তা তৃপ্তি পাবার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি উন্নতমানের রচনা যেভাবে উপভোগ করবেন। একজন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি সেভাবে করবে না। শিক্ষা-রুচির তারতম্যের জন্য তৃপ্তির মধ্যেও পার্থক্য ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের অবস্থান, শিক্ষা, স্বভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৃপ্তি পায়। গণমাধ্যমের শ্রোতাদের মনস্তাত্বিক গঠন তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেউ উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শুনে আনন্দ পেতে পারে, আবার একজন লোকসঙ্গীত শুনে অশেষ তৃপ্তি পেতে পারে। তৃপ্তি পাবার ক্ষেত্রে যিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন তারও একটি ভূমিকা থাকছে।

৪.৭ গণমাধ্যম ও মেয়েরা

গণমাধ্যমের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মেয়েরা গণমাধ্যমের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। গণমাধ্যমের শ্রোতা হিসেবে মেয়েদের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে বিরাট অংশ হল মেয়েরা। গণমাধ্যমে পরিচিত হয়ে তাঁদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। গণমাধ্যমের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে এই প্রতিক্রিয়ার চরিত্র অনুধাবন করা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়গুলির মধ্যেও মেয়েরা থাকছে। সংবাদপত্র থেকে টেলিভিশন সর্বত্রই পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যে মেয়েদের অবস্থান রয়েছে। ভিডিও ও সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে তার মধ্যেও রয়েছে মেয়েরা। কীভাবে মেয়েদের দেখানো হচ্ছে, বিষয়বস্তুর মধ্যে মেয়েদের ভূমিকা কীভাবে চিত্রিত হচ্ছে সেটা গণমাধ্যমের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সংবাদ থেকে ফিচার, সিরিয়াল থেকে ফিচার ফিল্ম সবক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর মধ্যে মেয়েরা রয়েছে।

গণমাধ্যমে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হচ্ছে তা নিয়ে নারীবাদী আন্দোলনের নেতৃবর্গের মেয়েদের ক্ষোভ রয়েছে। নারীবাদীরা মনে করেন গণমাধ্যমে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তার মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পক্ষপাত।

তাঁদের মূল অভিযোগের তীরটি রয়েছে ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসারে মেয়েরা হয়ে উঠেছে অবিচ্ছেদ্য উপাদান। বিজ্ঞাপনের মডেলে, সিরিয়ালের চরিত্রে মেয়েদের নামিয়ে আনা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে। যৌনতার আবেদনই যেখানে প্রধান হয়ে উঠছে। মানুষ হিসেবে নয়, পণ্য হিসেবেই তাদের উপস্থিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে। গণমাধ্যমে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণা গুলিতে প্রমাণিত হয়েছে যে মেয়েদের ভূমিকা চিত্রণে যথেষ্ট পক্ষপাত হয়েছে। মেয়েদের যে পণ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে যে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। মেয়েদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন পণ্যের বিজ্ঞাপনেরও মেয়েদের মডেল হিসেবে উপস্থিত করা হয়।

সিরিয়াল ও সিনেমায় পরিকল্পিতভাবে মেয়েদের ভূমিকা ও অবস্থান খাটো করে দেখানো হয়। ভারতীয় টেলিভিশনে অধিকাংশে মেয়েদের দেখানো হয় আদর্শ গৃহবধূ হিসেবে। মেয়েদের ভূমিকা হল পুরুষ স্বামীকে সুখী করা ও সন্তানদের প্রতিপালন করা। তাঁদের স্বাধীন সত্ত্বাকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। সিনেমায় মেয়েদের মনের চেয়ে শরীরের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ছবিতে। নাচে, গানে মেয়েদের যেভাবে চিত্রিত করা হয় তাতে যৌন আকর্ষণই প্রধান হয়ে ওঠে।

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা গণমাধ্যমের কার্যধারায় মেয়েদের অংশগ্রহণের বিষয়টির ওপরও গুরত্ব দিয়েছেন। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে মেয়েরা কী পরিমাণে অংশগ্রহণ করছে তাও অন্যতম বিচার্য বিষয়। গণমাধ্যম গবেষক Van Zoonen মনে করেন মেয়েরা যদি সংবাদ কক্ষে বেশি পরিমাণে নিযুক্ত হয় তাহলে সংবাদ পরিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হবে। প্রথাগতভাবে মেয়েদের বিষয়গুলিকে দেখবার প্রবণতা কমবে এবং মেয়েদের অবস্থান সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে। টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সিনেমা তৈরিতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ মেয়েদের প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরতে পারবে।

মেয়েদের বিষয় নিয়ে আজকাল বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব পত্রপত্রিকায় মেয়েদের জগতের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে। ভারতে মেয়েদের জন্য যে সব সাময়িকপত্র রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফেমিনা, উইমেনস্ এরা, মনোরমা, সানন্দা প্রভৃতি। টেলিভিশনেও মেয়েদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

৪.৮ গণমাধ্যম ও পরিবেশ

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনাতা বাড়াতে ও পরিবেশ রক্ষার গণমাধ্যম খুবই তাৎপর্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আইন করে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবেশ পুরোপুরি রক্ষা করা যায় না। পরিবেশ রক্ষিত হয় সাধারণ মানুষের সচেতনতায় এবং প্রচেষ্টায়। বাতাস, গাছ, পাহাড়, নদীর সঙ্গে মানুষের নিজের অস্তিত্ব জুড়ে আছে। প্রকৃতি যদি বিপন্ন হয় তাহলে মানুষের জীবনও সঙ্কটের মধ্যে পড়বে এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে গড়ে উঠলেই পরিবেশ রক্ষার কাজ সহজ হয়। পরিবেশ নিয়ে এই সচেতনতা ও উপলব্ধি তৈরি করতে গণমাধ্যম সবচেয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে, ফিচার ও অন্যান্য রচনায় পরিবেশ নিয়ে প্রতিনিয়ত লেখা হচ্ছে। মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য, বিশেষ করে সেই সমস্ত ঘটনার কথা যা পরিবেশকে বিপন্ন করছে। সাধারণ মানুষ এই সব রচনা পড়ে বুঝতে পারছে পরিবেশ রক্ষিত না হলে মানবজীবন এক মহাবিপদের মধ্যে পড়বে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে সংবাদপত্র।

টেলিভিশন, বেতার ও পরিবেশ বিষয়ে বিবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বিশেষ করে আলোচনামূলক অনুষ্ঠান যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়ে পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারে। টেলিভিশন বিপন্ন পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে বিপন্নতার প্রামাণিক দলিল হাজির করে আমাদের সামনে। পলি পড়ে যাওয়া নদীর ছবি, জলাশায় ভরাট হওয়ার ছবি, জঙ্গল কাটার ছবি তুলে ধরে বিপন্ন পরিবেশের প্রমাণ। মানুষ সহজেই বুঝতে পারে এতে কতখানি বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

আজ সারা বিশ্বজুড়েই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। এই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বনই হল গণমাধ্যম। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীতে মিশে যে ভয়ানক অবস্থায় সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে আমরা কম বেশি অনেক সচেতন হয়েছি। গণমাধ্যমই এই সচেতনতা তৈরি করেছে। বসুন্ধরা বৈঠক থেকে, জাতিপুঞ্জ সর্বস্তরেই উন্ন দেশগুলিকে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। পরিবেশ নিয়ে জনমত গঠনে গণমাধ্যমই সবচেয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

পরিবেশ বর্তমানে সাংবাদিকতায় একটি আলাদা জায়গা নিয়ে নিয়েছে। বহু সাংবাদিক পরিবেশ সম্পর্কে লেখার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। ভারতে পরিবেশ নিয়ে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে বহু তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে যে পরিবেশ আন্দোলন তৈরি হয়েছে তাতে গণমাধ্যমেরও ভূমিকা আছে। সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে ও টেলিভিশনে প্রচুর কভারেজ দেওয়া হয়েছে নর্মদা ও তেহার বাঁধের বিষয়ে। বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঐ দুটি বিশাল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে।

জলাশয় রক্ষা করার ব্যাপারেও সংবাদপত্র ও টেলিভিশন প্রচার চালায়। জলাশয় ও ভেড়ি বুজিয়ে বাসযোগ্য জমি করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কলকাতার সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। অনেকগুলি বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। পরিবেশবাদীরা যে আন্দোলন তৈরি করছে তাতে গণমাধ্যম অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আজকে মানুষ এটা বুঝেছে যে পরিবেশ রক্ষা না করলে সামনে সমূহ বিপদ। এই উপলব্ধির তৈরি করতে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যম।

৪.৯ গণমাধ্যম ও মানবাধিকার

সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার হল মানবাধিকার। মানবাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন মানবাধিকার বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে বর্তমান দিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে রাখছে এবং অভিজ্ঞ করে তুলছে। এই পৃথিবীতে মর্যাদার সঙ্গে জীবনের অধিকারকে সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠা করার অধিকার সমস্ত মানুষের আছে। বিশ্বের সমস্ত দেশেই এই অধিকারকে মৌল অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

তত্ত্বগতভাবে মানবাধিকার সর্বত্র স্বীকৃত হলেও বাস্তবে কিন্তু অনেক সময়ই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। বিনা বিচারে পুলিশ হেপাজতে কোন ব্যক্তিকে দিনের পর দিন রেখে দিলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী কিনা তা আদালতের বিচার সাপেক্ষ। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে বিচারের সুযোগ দিতে হবে। বিনা বিচারে পুলিশি হেপাজতে দীর্ঘসময় যদি কাউকে আটকে রাখা হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। আইনসম্মত বিচারপদ্ধতি থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি বঞ্চিত হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি পুলিশি হেপাজতে রাখা যায় না। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে আদালতের সামনে বিচারের জন্য হাজির করতে হয়। এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাহলে, সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের

মতো গণমাধ্যম এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ করতে পারে। মানবাধিকারের এই বিষয়টির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বহুবার সংবাদপত্র এই ধরনের ঘটনা নিয়ে সংবাদ করেছে।

পুলিসি হেপাজতে, জেল-হাজতে কোন বন্দীকে যদি অত্যাচার করা হয় তাহলে তা মানবাধিকার বলে চিহ্নিত হয়। পুলিসি হেপাজতে বন্দীকে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা আমাদের দেশে বহুবার ঘটেছে। সংবাদপত্রে টেলিভিশনে এই পুলিসি নির্যাতনে বন্দীমৃত্যুকে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে তা অনেক সময়ই সোরগোল ফেলে দিয়েছে। পার্লামেন্ট থেকে আইনসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আলোচনা ও বিতর্কে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি প্রতিবাদের সোচ্চার হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য। চোর বা ডাকাত সন্দেহে জনতা নিজের হাতে আইন তুলে নেয়। উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে মারে বেশ কয়েকজনকে। হামেশাই এরকম খবর সংবাদপত্রের পাতায় থাকে। এই ধরনের ঘটনা হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু প্রতিনিয়ত ঘটছে। বসনিয়া, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমরে লক্ষ লক্ষ মানুষ গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছে। জাতিদাঙ্গার এই ভয়াবহ পরিণতি মানিবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে কোন ধরনের গণহত্যাই মানবাধিকার হরণের চূড়ান্ত পর্যায়। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে পরিকল্পিত গণহত্যা ঘটেছিল, ২০০২ সালে গুজরাতে যে নরমেধ যজ্ঞ সংগঠিত হয়েছিল তা সর্বদিক দিয়ে মানবাধিকারকে লঙ্ঘিত করেছিল।

দেশে যখন দুর্ভিক্ষ ঘটে, তখনও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ আফ্রিকার দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ন্যূনতম আহারের সংস্থান করতে পারে না, এবং নিরন্ন মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করে তখন তাও হয় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত প্রমাণ।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ধরনের ঘটনাই ঘটুক না কেন গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হল ঐ ঘটনাকে সংবাদ করে সাধারণ মানুষের গোচরে নিয়ে আসা। শুধু তথ্য সরবরাহ করে নয়, মতামত ও পর্যালোচনা প্রকাশ করে ও মানবাধিকা লঙ্ঘনের বিষয়টিকে প্রকাশ্য আলোচনায় নিয়ে আসে।

সাম্প্রতিককালে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে পর্যাপ্ত কভারেজ দিয়ে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মানবাধিকর লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যখন ঘটে তখন সরকার তা প্রচার করতে একেবারেই উৎসাহী হয় না। দেশে বিদেশে সর্বত্রই একথা সত্য। আফ্রিকায় যখন দুর্ভিক্ষ ঘটেছে তখন পশ্চিমি গণমাধ্যমগুলি ঐ ঘটনার বিস্তৃত কভারেজ দিয়েছে বলেই আমরা জানতে পেরেছি। যে সব দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে তারা কিন্তু কখনই বিশ্বের দরবারে বিষয়টি হাজির করেনি। কারণ এটা তাদের ব্যর্থতা। সব সরকারই চায় ব্যর্থতা ঢাকতে। কিন্তু গণমাধ্যমের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষের খবর সমগ্র বিশ্বের মানুষ জানতে পারে। পশ্চিমি গণমাধ্যমগুলি বিশেষ করে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলি যে বিস্তৃত কভারেজ দিয়েছিল তার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্য। চিকিৎসার সরঞ্জাম দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশগুলিতে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজনীতির, কূটনীতির উর্দ্ধে উঠে বিভিন্ন দেশে এই যে সাহায্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার পিছনে গণমাধ্যমগুলির অবদান যথেষ্ট ছিল।

মানবিক অধিকার ভঙ্গের অনেক সাড়াজাগানো খবর বার করার জন্য তদন্তমূলক সাংবাদিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে উদ্যোগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে বহু মানবিক অধিকারভঙ্গের খবর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অরুণ শৌরীর করা ভাগলপুরে জেলে বন্দীদের অন্ধ করার খবর উল্লেখ করা যেতে পারে। খবরটি

সারা দেশে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল।

মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে গণমাধ্যম বর্তমানে সতর্ক প্রহরীর মতো কাজ করে। অধিকার লঙ্ঘের সম্ভাবনা অনেকখানি কমিয়ে দেয়।

৪.১০ সারাংশ

গণমাধ্যমের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় গণজ্ঞাপন ক্রিয়া। তাই গণজ্ঞাপনের আলোচনায় গণমাধ্যমের কার্যধারা বোঝা প্রয়োজন। গণমাধ্যম যন্ত্র নির্ভর। বার্তার চরিত্র নৈর্ব্যক্তিক। একই সঙ্গে বহু মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। পরিচালিত এই বার্তা শ্রোতাদের ওপর কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যেটা জানলে গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে।

গণমাধ্যমের বার্তা লক্ষ শ্রোতাকে কম বেশি প্রভাবিত করে। লক্ষ শ্রোতারা হল সংবাদপত্রের পাঠক, বেতারের শ্রোতা এবং টেলিভিশনের দর্শক। ঐতিহাসিক দিক থেকে সংবাদপত্রের সামাজিক প্রভাব একটি স্বীকৃত ঘটনা। সংবাদপত্র ও বেতার মানুষের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নিরক্ষর ও দরিদ্র দেশে বেতারের প্রভাব বেশি। টেলিভিশনের আবির্ভাবের পর গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। প্রথম দিকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন এই প্রভাব ছিল খুব স্বল্প। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞরা অনুধাবন করেন যে এই প্রভাবের ব্যপ্তি বিশাল। দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমে হিসেব টেলিভিশন দ্রুত মানুষের মন জয় করার ফলে প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল পণ্য সংস্কৃতির প্রসার। সমস্ত গণমাধ্যমেই প্রচারিত বিজ্ঞাপন মানুষের মনে পণ্য কেনার প্রবণতা তৈরি করছে। পণ্যসংস্কৃতি ভোগবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে। গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুও ভোগবাদের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করছে। বিশেষ করে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মানুষের মনে তৈরি করছে আরও উন্নততর জীবনযাত্রার স্তরে উন্নত হবার আকাঙ্খা, জনশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েও গণমাধ্যম সমাজজীবনকে প্রভাবিত করছে। পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার ওপর টি.ভি. অনুষ্ঠান, সংবাদপত্রের নিবন্ধ সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে।

গণমাধ্যমের আলোচনায় শ্রোতৃমন্ডলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মানুষ আছেন এই শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে। সহজে শ্রোতৃমন্ডলীকে চেনা যায় না। অনুমানে গড়ে ওঠে। মাধ্যম অনুযায়ী তাদের চরিত্র আলাদা হয়।

শ্রোতৃমন্ডলীকে ভালভাবে বোঝায় জন্য কতকগুলি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল স্থান, মানুষ, মাধ্যম, বিষয়বস্তু ও সময়। শ্রোতৃমন্ডলীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এর জন্য অন্যতম হল স্বেচ্ছাধীন শ্রোতৃমন্ডলী, সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী, বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী এবং স্থান ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী। শ্রোতৃমন্ডলী চরিত্র বোঝার জন্য গবেষণার সাহায্য নেওয়া হয়। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় এই গবেষণার জন্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর এই গবেষণা থেকে দুটি দিক পরিস্ফুট হয় — (১) শ্রোতা কে (২) বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। বিজ্ঞাপনদাতারও জানতে পারে কারা তাদের লক্ষশ্রোতা। শ্রোতৃমন্ডলীর গবেষণার ছ'টি উদ্দেশ্য রয়েছে।

মানুষ গণমাধ্যমের ব্যবহার বিভিন্নভাবে করে। গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে করতেই মানুষ ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ব্যবহারের সুফল এবং কুফল দুটি দিকই রয়েছে। তিনভাবে গণমাধ্যম ব্যবহৃত হতে পারে — ব্যক্তিগত স্তরে, পারিবারিক স্তরে এবং প্রকাশ্য স্তরে। একটি স্তর অবশ্য অন্য স্তরের

সঙ্গে অনেকসময় যুক্ত হয়ে থাকে। কম্পিউটার ও উপগ্রহ চ্যানেল মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করছে। মাত্রাটি হল মিথষ্ক্রিয়তা।

গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তৃপ্তি। মাধ্যম অনুযায়ী তৃপ্তি পাবার মাত্রাতে তারতম্য ঘটে। টেলিভিশনে তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ৪টি শ্রেণীতে ৩১ ধরণের তৃপ্তি হতে পারে। তৃপ্তির উৎস রয়েছে উপভোগ করার মধ্যে। মানুষ নিজের অবস্থান, শিক্ষা, স্বভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৃপ্তি পায়।

গণমাধ্যমের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ্য শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েদের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেকটা জায়গা নিয়ে আছে মেয়েরা। নারীবাদীরা মনে করেন গণমাধ্যমে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তার মধ্যে যথেষ্ট পক্ষপাত রয়েছে। বিজ্ঞাপনের মডেলে, সিরিয়ালের চরিত্রে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তাতে মনে হয় মেয়েরা ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। যৌনতার আবেদনই প্রধান হয়ে উঠছে। পরিবারে মেয়েদের ভূমিকা সন্তান প্রতিপালন করা ও পরিবারের সদস্যদের সুখী করা। তাঁদের স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বের কথা একেবারেই বলা হয় না। গণমাধ্যমে মেয়েদের অংশগ্রহণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেয়েরা যদি গণমাধ্যমের কার্যধারায় অংশগ্রহণ করে তাহলে মেয়েদের ভূমিকার চিত্রণ অবশ্যই একটু অন্যরকম হবে। মেয়েদের বিষয় নিয়ে আজকাল বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষায় গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন পরিবেশ বিষয় রচনা ও অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলে। অরণ্য নদীকে রক্ষা করার সঙ্গেই আমাদের অস্তিত্ব যুক্ত হয়ে আছে। বাতাসে দূষিত হলে আমাদের জীবনও বিপন্ন হবে। গণমাধ্যমই এ বিষয়ে আমাদের সজাগ করছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার যে সূত্রপাত ঘটেছে তার পিছনে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানবাধিকার হল একটি মৌল অধিকার। এই অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। গণহত্যা, দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু এসবই হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ। গণমাধ্যম এই সব বিষয়ের ওপর কভারেজ দিয়ে সাধারণ মানুষের গোচরে নিয়ে আসে। ফলে জনমত তৈরি হয় এবং প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। মানবাধিকার বিষয়ে খবর করার জন্য সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনকে নিজ উদ্যোগ কাজে নামাতে হয়, অনেক সময় তদন্তমূলক সাংবাদিকতার আশ্রয় নিতে হয়। মানবিক অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম সতর্ক প্রহরীর মতো কাজ করে।

৪.১১ অনুশীলনী

১) গণজ্ঞাপনের গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

২) গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব কী?

৩) বিজ্ঞাপণের কি আলাদা প্রভাব আছে?

৪) শ্রোতৃমন্ডলী কী?

৫) শ্রোতৃমন্ডলী চরিত্র বুঝতে কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ?

৬) শ্রোতৃমন্ডলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৭) শ্রোতৃমন্ডলী গবেষণা কাকে বলে?

৮) শ্রোতৃমন্ডলী গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি কী?

৯) গণমাধ্যম ব্যবহারের স্তরগুলি কী?

১০) তৃপ্তি কাকে বলে? তৃপ্তিকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

১১) গণমাধ্যমে মেয়েদের অবস্থান কী?

১২) পরিবেশিত বিষয়বস্তুতে মেয়েদের কীভাবে দেখানো হয়?

১৩) নারীবাদীদের অভিযোগগুলি কী?

১৪) মেয়েদের গণমাধ্যম কার্যধারায় অংশগ্রহণ কি প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবে?

১৫) মেয়েদের জন্য কয়েকটি পত্রিকার নাম করুন।

১৬) পরিবেশ রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

১৭) গণমাধ্যম কি এবিষয়ে জনমত গঠন করতে পারে?

১৮) মানবাধিকার কী?

১৯) মানবাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম কী ভূমিকা পালন করে?

২০) মানবাধিকার বিষয়ে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সুযোগ আছে কী?

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১) গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩) Mass Communication Today — Subir Ghosh

৪) Mass Communication Theory — Denis McQuail

৫) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী — এম.এল.ডি. ফ্লার ও এস.জে.বল-রোকেশ (অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন)

৬) Women and Media — Edited by Pradip Mathur

৭) Mass Communication Theory — Denis McQuail

৮) Media Issues — K. M. Shrivastava.

৯) ভারতীয় গণমাধ্যম — বংশী মান্না

একক ৫ □ উন্নয়ন ও জ্ঞাপন

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা

৫.৩ উন্নয়ন মডেল

৫.৪ উন্নয়ন তত্ত্ব

৫.৫ উন্নয়নে যোগাযোগ তত্ত্ব

৫.৬ উন্নয়নের লক্ষ্য

৫.৭ জ্ঞাপন ও উন্নয়ন

৫.৮ সারাংশ

৫.৯ অনুশীলনী

৫.১০ পরিভাষা

৫.১১ গ্রন্থসূচী

৫.০ উদ্দেশ্য

উন্নয়ন কী? এ প্রশ্নে নানা মুনির নানা মত। প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়ন ধারণা বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশ পরে লক্ষ্য করা গেল জ্ঞাপন ও উন্নয়নে একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। তবে মূলত জ্ঞাপন ও উন্নয়নের সম্পর্ক কি সে বিষয়ে ধারণা গড়ে তোলাই এই এককের উদ্দেশ্য।

৫.১ প্রস্তাবনা

উন্নয়ন একটি সামাজিক কর্মকান্ড। সমাজকে ঘিরে যে ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদের কর্মকান্ডই প্রতিফলিত হয় তাদের সমাজ বিন্যাসে। সুতরাং উন্নয় প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যে জরুরি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞাপন বা যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে এই বিশাল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং উন্নয়নকে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প জ্ঞাপনকে উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৫.২ উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা

'উন্নয়ন সংক্রান্ত' ধারণা সমাজ বিজ্ঞানে অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন একটা বহুমাত্রিক বিষয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন প্রশ্নের ধারণাও বদলেছে গুণগতভাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উন্নয়ন প্রশ্নে নতুন ধারণা জন্ম নিতে থাকে। এই ধারণার মূল বক্তব্য হল 'সব উন্নয়নই মানব উন্নয়ন'। অর্থাৎ উন্নয়নের অর্থ হল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানের এবং তার জীবন প্রতিবেশের (environment) উন্নয়ন। কিন্তু উন্নয়ন সংক্রান্ত পূর্বধারণায় মানবিক ও পরিবেশের নানা উপাদান, উপকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আড়ালে থেকে যায়। চল্লিশের দশকে উন্নয়নমূলক ধারণা ছিল ইউরোপ কেন্দ্রিক এবং উন্নয়ন বলতে তখন শিল্পায়ণকেই বোঝাত।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর দশকে আধুনিকীকরণ, গণতান্ত্রিকতার প্রসার, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ইত্যাদি এবং উন্নয়ন ছিল সমার্থক।

৫.৩ উন্নয়ন-মডেল

আধুনিক কালের ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা পশ্চিমী উন্নয়ন ধারণাকে পরিশিলীত রূপ দিয়ে একটা 'মডেল' (Model) তৈরীর চেষ্টা করেন। তাঁদের লক্ষ্য এই মডেল যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মডেলটি সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল —

- শিল্প দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সুতরাং বিনিয়োগের সিংহভাগই শিল্প, পরিবহন, কাঁচামাল এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে।
- শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও দক্ষ ব্যক্তি জরুরী। তাঁরা তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা পালনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
- দেশের শ্রমশক্তিকে যথার্থভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এবং সরকারী পরিচালন প্রক্রিয়ায় যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে জন্য জনশিক্ষা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর জোর দিতে হবে।
- প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো জরুরী।

উল্লিখিত উন্নয়ন মডেল উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরে। তবে উন্নয়ন প্রশ্নে নির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫.৪ উন্নয়ন তত্ত্ব

১৯৫০ থেকে ১৯৭০-র দশকের মধ্যে উন্নয়ন প্রশ্নে কয়েকটি তত্ত্ব তুলে ধরা হয়। সেগুলি হল —

ক) অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Economic Theory)

খ) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory)

গ) রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory)

ঘ) যোগাযোগ তত্ত্ব (Communication Theory)

ক) অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Economic Theory) ঃ

১৯৫০-এর দশকের অর্থনীতির সমালোচকগণ উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের বিষয়টি বাতিল করে দেন। ওয়াল্ট রসটো (Walt Rostow) তাঁর 'দ্য স্টেজেস্ অব ইকোনমিক' গ্রন্থে উন্নয়নের পাঁচটি স্তর তুলে ধরেছেন —

(১) ঐতিহ্যবাহী সমাজ (২) 'টেক অফ'-এর পূর্বশর্ত, বা অবস্থা (৩) 'টেক অফ' (৪) ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং (৫) নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিজের উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়া বজায় থাকলে বাইরের সাহায্য ছাড়াই দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

কিন্তু শুরু থেকেই রাষ্ট্রের এই ধারণা সমালোচনার সম্মুখীন। সমালোচকদের মতে রাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী ধারণা আধুনিকতার পরিপন্থী। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, রাষ্ট্রে উল্লিখিত পাঁচটি স্তর পেরিয়ে পশ্চিমের দেশগুলি উন্নত হয়েছে? পরবর্তী সময়ে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এক রিভিউয়ে ফ্রেডরিক ফ্রে (Frederic Frey) বলেন যে উন্নয়নের প্রশ্নে অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকরা যোগাযোগ সংক্রান্ত ফ্যাক্টরসগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, এমনকি অনেকে বিষয়টিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

খ) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory) ঃ

অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকেরা উন্নয়ন বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজের ও দেশের বৃহৎক্ষেত্রের পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সমর্থকরা উন্নয়নকে দেখতে চেয়েছিলেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উন্নয়ন হোল আধুনিকতার সমস্যা এবং ব্যক্তি স্তর থেকেই উন্নয়নের শুরু। এ ব্যাপারে দুই মার্কিন গবেষকের গবেষণালব্ধ কাজ উল্লেখ্য। ডেভিড সি. ম্যাকল্যান্ড (David C.McClelland)-র 'The Achieving Society' 1961, এবং অপরটি হোল 'On the theory of Social Change' 1962 — যার রূপকার হলেন এভারেট ই. হোজেন (Everett E.Hogen)। উল্লেখ করা জরুরি যে উভয়ের গবেষণা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয়। তাঁদের মতে, সমাজ পরিবর্তনে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই নির্ধারক ভূমিকা পালন করে থাকে। হোজেন তাঁর গবেষণায় এই অভিমত প্রকাশ করেন, সামাজিক পরিকাঠামো ও ব্যক্তির কর্মকান্ড পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রাক্-আধুনিক এবং আধুনিক মানুষের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক মানুষ অনেক বেশী সৃজনশীল (Creative), অনুসন্ধিৎসু (innovative)।

গ) রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory) ঃ

রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বা বিন্যাস নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। এই মতের সমর্থকদের মতে তৃতীয় বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে সেই দেশ গুলির কাছে জরুরী ছিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব লাভ। তাছাড়া, সদ্য স্বাধীন দেশ গুলি ছিল বহু ভাষা, জাতি, ধর্ম, উপজাতি সমন্বিত দেশ। স্বাভাবিকভাবেই এই দেশগুলির কাছে জাতীয় সংহতি গঠনের বিষয়টি ছিল বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।

১৯৫০—৬০ এর দশক পর্যন্ত চলতি ধারণা অনুসারে এটা মনে করা হোত যে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকরা পরামর্শ দেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে

পশ্চিমী ধাঁচের ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিক স্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের চর্চা জরুরি। জরুরি অবাধ বাণিজ্য বাজার।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তারা গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম গুলির ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু তাদের মতে গণমাধ্যমের ভূমিকা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। অর্থাৎ উন্নয়নের অন্যান্য বিষয়গুলি আড়ালে চলে যায়। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন হল বহুমাত্রিক বিষয়।

৫.৫ উন্নয়নে যোগাযোগ তত্ত্ব

গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক যোগাযোগ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন মার্কিন বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল লার্নার (Daniel Lerner)। তিনি তাঁর 'The Passing of Modernity' (১৯৫৮) গ্রন্থে উন্নয়ন পদ্ধতিকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শীলতায় (Variables) ভাগ করেছিলেন। সেগুলি হল ঃ নগরায়ন (urbanization), নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণমাধ্যমের প্রচার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় আরো বেশি অংশগ্রহণ। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের আরো বেশি অংশগ্রহণের বিষয়টি মাথায় রেখে সাক্ষরতা ও গণমাধ্যমের প্রসার ও প্রচারের উপর জোর দেন ড্যানিয়েল লার্নার। উন্নয়ন প্রশ্নে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন (modern individual) লার্নারের কাছে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন হল পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে সজাগ রাখা এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলা।

১৯৭০ দশকের মধ্যভাগ থেকে উন্নয়সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমী ধারণার আধিপত্যবাদকে ঘিরে প্রশ্ন ওঠে। এটা মনে করা হয় যে, গোড়ার পর্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে গণযোগাযোগ গুরুত্ব পেতে থাকে এবং বিষয়টিকে উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

মাস মিডিয়া—ম্যাজিক—মাল্টিপ্লায়ার ঃ

ড্যানিয়েল লার্নারের বিষয়টিকে আরো পরিশীলিত রূপ দেবার চেষ্টা করেন আরেক মার্কিনী বিশেষজ্ঞ উইলবার শ্র্যাম (Willber Schramm)। তাঁর মতে গণমাধ্যম 'the magic multiplier' বা জাদু গুণক। দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রেস, বেতার সম্প্রচার, ফিল্ম এবং টেলিভিশন ইত্যাদি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা গঠনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও ইউনেস্কো একটা কার্যকরী প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেয়। উইলবার শ্রামের ম্যাজিক মাল্টিপ্লাইয়ার তত্ত্ব ছিল তারই একটা অংশ।

শ্র্যামের মতে তৎকালীন সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ পরিবর্তনে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা ছিল সমাজ পরিবর্তনের এজেন্টের মত। আচরণ, বিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনে গণমাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, অনুপযুক্ত চলতি রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, বাঞ্ছিত ও উপযুক্ত রীতিনীতি সন্ধান এবং সে সম্পর্কে জনসমাজকে ওয়াকিবহাল করা। এইভাবে একটা দেশ তার জনগণের সচেতনতা প্রসারিত করবে এবং নতুন রীতি-নীতি সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা তুলে ধরে তাকে বাস্তবে রূপায়ণ করবে। শ্র্যাম জোর দিয়েই বলেন যে, মানুষের ধ্যান ধারণার প্রসারণে, আশা-আকাঙ্খা বৃদ্ধিতে এবং সর্বোপরি উন্নয়নের পরিবেশ তৈরিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গণমাধ্যমের এই ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে উইলবার শ্র্যাম প্রস্তাব দেন যে তথ্য লেনদেনের বিভিন্ন বাধা দূর করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বচ্ছতার পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরী। একই সঙ্গে ওই দেশগুলিতে নতুন

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করা এবং তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, সম্পদ এবং আধুনিক গণমাধ্যম ও তার প্রযুক্তি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন আজকের দিনে বড় চ্যালেঞ্জ। শ্যাম এই অভিমতপোষণ করেন যে গণমাধ্যমের এই জাদুগুণক কে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব।

৫.৬ উন্নয়নের লক্ষ্য

আধুনিক উন্নয়ন পাঁচটি লক্ষ্যপূরণ করতে চায়। সেগুলি হল ঃ—

(১) গ্রামীণ উন্নতির প্রতি জোর ঃ কোন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই দেশের দরিদ্র মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে কতখানি সাহায্য করছে সেটি উন্নয়নের বড় মাপকাঠি। আমরা জানি উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে গ্রামীন উন্নতি এসব দেশে উন্নয়নের নির্দেশক।

(২) জীবন ধারণের উৎকর্ষতাবৃদ্ধি ঃ প্রচলিত অর্থে উন্নয়নের প্রধান পরিমাপ হল মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধি। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি নিজের জীবনকে উন্নততর করার জন্য কতখানি আগ্রহ পোষণ করছেন এবং সেই চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট দেশের উপকরণগুলি কতখানি সহায়ক তার উপর উন্নয়ন পরিমাপ নির্ভর করছে। সুতরাং উন্নয়নের যেসব দিক ব্যক্তিগত উৎপাদক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও সামাজিক প্রয়োজন মেটায় সেগুলির উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়।

(৩) জনসাধারণের অংশগ্রহণ ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রিয় ভূমিকায় রয়েছে জনগণ। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যই হল জনগণ এবং তার জীবন প্রতিবেশের উন্নতি সাধন করা। সে জন্য পরিকল্পনাবিদ্‌রা মনে করেন জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বাগ্রে জানতে হবে উন্নয়নের দ্বারা জনসাধারণ তাঁদের কি কি উপকার করতে চান। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

(৪) স্বনির্ভরতা অর্জন ঃ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা অনুসারে উন্নয়-সংক্রান্ত কোন পশ্চিমী মডেল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আদর্শ উন্নয়ন হল বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন। প্রত্যেকটি দেশ, এমনকি প্রতিটি গ্রাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন অনুসারে স্বতন্ত্র উন্নয়নের পথ বেছে নেবে। গ্রামীণ উন্নয়ন হবে স্থানীয় কৃষ্টি শিল্পভিত্তিক উন্নয়ন। এই ধরনের গ্রামীন অর্থনীতি বিদেশী সাহায্য ও প্রযুক্তি সহায়তার উপর নির্ভরশীল নয়।

(৫) উন্নয়নের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার সমন্বয় ঃ গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্য শুধুমাত্র কৃষ্টি, অর্থনৈতিক নয়, উন্নয়ন হল এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। স্থানীয় কৃষ্টিভিত্তিক শিল্প, গৃহ উন্নয়ন, পাণীয় জল সরবরাহ, শক্তির উৎস সৃষ্টি, স্যানিটেশন, পথ-ঘাট, পরিকাঠামো — এ সমস্ত উন্নয়ন এক কথায় গ্রামীণ উন্নয়ন। কৃষি ও শিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠলেও তার উদ্দেশ্য বহুমুখী। এই বহুমুখী উন্নয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন উন্নয়নের গুরুর্তপূর্ণ শর্ত।

৫.৭ জ্ঞাপন ও উন্নয়ন

জ্ঞাপনের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক খুব নীবিড়। উন্নয়ন এক সামাজিক কর্মকান্ড এবং জনগণের সদিচ্ছা ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। জ্ঞাপনের প্রশ্ন তাই স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। ড. উইলবার

শ্র্যাম তাঁর "মাস মিডিয়া অ্যান্ড ন্যাশনাল ডেভেলেপমেন্ট" গ্রন্থে লিখছেন, "In the service of national development, the mass media are agent of social change" অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমই হল সমাজ পরিবর্তনের এজেন্ট।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্বনির্ভরতা এবং জোটনিরপেক্ষতার দাবি ঘোষণা করে। আর এই প্রেক্ষাপটেই উন্নয়নমূলক যোগাযোগ জ্ঞাপন সংক্রান্ত গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশগুলি দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে, দারিদ্র্যতা দূরীকরণের, সাক্ষরতার প্রসারের এবং কর্মবিনিয়োগের দ্রুত পথ খুঁজতে থাকে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

ঔপনিবেশিক মুক্তির পর সদ্য স্বাধীন দেশগুলি যোগাযোগের ঔপনিবেশিক কাঠামো দূর করে দেশের স্বার্থক যোগাযোগ বিন্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তথ্য-সম্পদ সংক্রান্ত ধারণা এই দেশগুলির কাছে বলা যেতে পারে এক নতুন উপলব্ধি।

তাছাড়া, পশ্চিমী কিছু অর্থনৈতিক সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য পরামর্শদাতারা এই অভিমত পোষণ করেন যে, নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পের প্রসার এবং উন্নয়নমূলকও উন্নতমানের গণজ্ঞাপন বিন্যাস বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

৫.৮ সারাংশ

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণারও বদল ঘটেছে। হাজির হয়েছে উন্নয়ন তত্ত্ব। পশ্চিমীরা গঠন করল উন্নয়নমডেল। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে উন্নত দেশগুলির পরিকাঠামোগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে পশ্চিমীমডেল এদেশে তার কার্যকারিতা হারায়, তবে নানা মতপার্থক্যেও যোগযোগের ইতিবাচক ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করে।

৫.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত নোট ঃ

১. অর্থনৈতিক তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব, উন্নয়নমূলক জ্ঞাপন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. উন্নয়ন মডেলের প্রধান বক্তব্যগুলি কী কী?

২. উন্নয়ন বলতে ঠিক কি বোঝায়?

৩. উন্নয়ন ও জ্ঞাপন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত—যুক্তি দিয়ে এসম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. উন্নয়নের লক্ষ্য কী?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১. উন্নয়ন কী? জ্ঞাপনকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় — এই বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২. উন্নয়ন তত্ত্বগুলি কী কী? কোন তত্ত্বটি উন্নয়নে বেশি প্রাসঙ্গিক এবং কেন?

৩. উন্নয়নের লক্ষ্য কী? এই লক্ষ্যপূরণে জ্ঞাপন কতটা কার্যকরী?

৫.১০ পরিভাষা

■ environment — জীবনপ্রতিবেশ ■ innovative — অনুসন্ধিৎসু ■ creative — সৃজনশীল ■ Variables — পরিবর্তনশীলতা ■ modern individual — ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ■ urbanization — নগরায়ন ■ magic multiplier — জাদুগুণক ■ customs — রীতিনীতি

৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ্য ঃ—

১. গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২. Mass Communication In India — Keval J. Kumar

৩. Communication & Development — Everett M. Rogers

৪. The Passing of Traditional Society — David Lerner

৫. Encyelopedia of International Communication (Vol.-2) — Barnouw, Gerbner, Schramm, Worth and Gross.

৬. The passing of moderning — Hamid Mowlana

৭. Communication for Development in the Third World — Melkote Steeves.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. Communication and Social change in developing Nations — Goran Hedebro

২. Communication and Development : Critical Perspectives — Beverly Hills, Calif

৩. Development Communication : Information, Agriculture, and Nutrition in the Third World — Robert Hornik

একক ৬ □ উন্নয়ন পরিকল্পনা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ

৬.৩ ডমিন্যান্ড প্যারাডাইম

৬.৪ বিকল্প প্যারাডাইম

৬.৫ সাইট

৬.৬ খেদা প্রকল্প

৬.৭ সারাংশ

৬.৮ অনুশীলনী

৬.৯ পরিভাষা

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

উন্নয়ন প্রশ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সঠিক প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে রয়েছে নানা মত ও পথ। আমাদের দেশে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে সব বিষয়গুলি আলোচনা করে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬.১ প্রস্তাবনা

উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা অনুসারে উন্নয়ন হল একটি দেশের প্রয়োজন অনুসারে একটি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে কোন সমাজকে পরিবর্তিত করা। প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে গ্রহণ করতে হয় সঠিক পরিকল্পনা এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচন জরুরি। আমাদের দেশে উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনা যেমন সাইট, খেদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করা না গেলেও সেগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ এমন বলা যায় না।

৬.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ

উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ বা জ্ঞাপন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ একটা সচেতন এবং পরিকল্পিত (Planned) প্রচেষ্টা। চলতি সমস্যা, প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় গণমাধ্যম প্রতিফলিত করে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা, প্রয়োজন সমাধানের লক্ষ্যে গণমাধ্যমগুলি জনসচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং আচার আচরণের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তি এই পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন।

বার্তা (Message) নির্বাচন ঃ

গবেষণা ও নানা সূত্র মারফত তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা বা প্রয়োজনীয় বিষয় চিহ্নিত করার পর গণমাধ্যমের চরিত্র, তার ধরণ এবং সুবিধা অনুসারে বার্তা তৈরি করতে হয়। কাঙ্খিত জনগণ অর্থাৎ যাদেরকে লক্ষ্য রেখে এই বার্তা, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সংক্রান্ত নানা বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্তার ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, আকার, বাক্যবিন্যাস করতে হয়।

গণমাধ্যম পরিকল্পনা ঃ

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে গণমাধ্যম সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণে কতকগুলি বিষয় বিবেচনায় রাখা জরুরী।

প্রথমত, নীতি। ইউনেস্কো এই নীতি সম্পর্কে বলছে, Communication policy is "sets of principles and norms established to guide the behaviour of communication system."

দ্বিতীয়ত, অর্থাৎ গণমাধ্যম সংক্রান্ত নীতি (Policy) হল সুগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, তার গঠন, প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক দিকটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যদিকে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমে যোগাযোগ নীতিকে ব্যবহার করার কৌশল ও পরিকল্পনার অঙ্গ।

তৃতীয়ত, অর্থ, শ্রম-সম্পদ এবং অন্যান্য বস্তুগত বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এগুলি ছাড়াও আরো কিছু বিষয় পরিকল্পনা গ্রহণের সময় নজরে রাখতে হয়। সেগুলি হল —

১) সমাজের বা সামাজিক সম্প্রদায়ের পশ্চাদপট, তাদের সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয়গুলির যথাযথ বিশ্লেষণ ও তা বোঝা জরুরী।

২) সমস্যা বা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুসারে সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী গণমাধ্যম সংক্রান্ত পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

৩) সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠীতে চালু থাকা মাধ্যম তা সে আধুনিক মাধ্যম বা লোক-গণমাধ্যম (folk media) যাই হোক না কেন, গণমাধ্যম ব্যবহারের সময় এই দিকটিও বিবেচনা রাখতে হয়। তাছাড়া কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে (Community) কোন ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব থাকতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন ঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনায় শুধুমাত্র, গণমাধ্যম ক্ষেত্রের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ, মনোবিজ্ঞানী,

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। কারণ তাঁরা সমাজ, তার গঠন, সামাজিক মূল্যবোধ, সমাজের প্রয়োজন এবং তার সামর্থ সম্পর্কে দক্ষ। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তারা আগাম আন্দাজ তুলে ধরতে পারেন।

পরিকল্পনা প্রয়োগ ঃ—

পরিকল্পনা গ্রহণের পরই আসে পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের বিষয়টি। পরিকল্পনা গ্রহণের মত বাস্তবায়নের বা প্রয়োগের বিষয়টিকেও যথেষ্ট নজর দিতে হয়। পরিকল্পনা প্রয়োগের সময় তার যথার্থ প্রয়োগের প্রতি সতর্ক থাকা যেমন জরুরী, তেমনি কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তা দূর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হয়।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিটি পর্বে সতর্ক নজরদারি প্রয়োজন। এখানে নজরদারি মানে কাঙ্খিত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে জনমানসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া খুটিয়ে লক্ষ্য করা। প্রতিক্রিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রোগ্রামের কিছু পরিবর্তন করে প্রোগ্রামকে কার্যকরী করে তোলা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় গণমাধ্যমের ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হলেও উন্নয়ন-প্রকৌশল (Strategy) ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। প্রকৌশলের উপরও নির্ভর করে একটি ক্যাম্পেন বা অভিযানের সাফল্য ও অসাফল্য। এ প্রসঙ্গে ১৯৬০-এর 'পরিবার পরিকল্পনা' প্রোগ্রামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা অভিযানে রেডিও, টেলিভিশন, হোর্ডিং, ফিল্ম, মুদ্রণমাধ্যম প্রায় সমস্ত প্রকার গণমাধ্যম ব্যবহার করেও কাঙ্খিত সাফল্য লাভ হয়নি। 'Ek Ya Do Bus' অর্থাৎ একটা অথবা দুটো সন্তান ব্যাস, আর নয়। কিন্তু গ্রাম বা মফঃস্বলের খেটে খাওয়া পরিবার গুলিতে এই স্লোগান গ্রহণযোগ্য হয়নি। এই সব পরিবারের কাছে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তান ছিল একমাত্র কাঙ্খিত বিষয়। ফলে যে সব পরিবার দু-তিনটি কন্যাসন্তান জন্ম দেন তারা পুত্রসন্তান লাভ না করা পর্যন্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

অবশ্য অনাগ্রহের পিছনে ঐসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বিষয় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

৬.৩ ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তর পর্বে উন্নয়নের প্রশ্নে উঠে আসে 'ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম' তত্ত্ব। পশ্চিমী এই তত্ত্বে উন্নয়নে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। বলা হয় উন্নত গণমাধ্যম ব্যবস্থা একটা দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। গণমাধ্যমগুলি বেশি বেশি তথ্য তুলে ধরে তথ্য সমৃদ্ধ জনসমাজ গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু পরবর্তীকালে উন্নয়নের প্রশ্নে এই তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায় 'ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম' তত্ত্বে তথ্য প্রবাহ একমুখী — গণমাধ্যম থেকে জনগণ। ১৯৬১ — ১৯৭০ এই সময় পর্বকে রাষ্ট্র সংঘ উন্নয়নের দশক হিসেব চিহ্নিত করে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই ধারণার মূল প্রবক্তা ড্যানিয়েল লার্নার। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমের প্রসার ঘটলেই উন্নয়ন সম্ভব, এমন নয়। এই ব্যর্থতাই 'ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম' তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বাস্তবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, গণমাধ্যম উন্নয়নের এক এবং একমাত্র শর্ত নয়। এর পিছনে আরো অনেক ফ্যাক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নেতৃত্ব

প্রদানকারী ব্যক্তিরাও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। ভূমিসংস্কার না করলে শুধুমাত্র গণমাধ্যম এককভাবে উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম, তত্ত্বের ব্যর্থতার পর তাই উঠে আসে বিকল্প প্যারাডাইম (alternative paradigm) সংক্রান্ত ধারণা।

৬.৪ বিকল্প প্যারাডাইম

আশির দশকে 'উন্নয়ন' এবং 'পরনির্ভরশীলতা'-র বিকল্প প্রক্রিয়া হিসেবে উঠে আসে বিকল্প প্যারাডাইম এই দৃষ্টিভঙ্গী জোর দেয় জাতির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপাশি, বাহ্যিক বিষয়গুলির উপর, যে গুলি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সমসাময়িক বেশকিছু বিশেষজ্ঞ জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নে 'আত্ম-স্বনির্ভরশীলতা'র (Self-reliance) বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে থাকেন। আন্তর্জাতিকস্তরে পশ্চিমীদেশগুলির অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদকে নিরসন করার উদ্দেশ্যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি 'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস' এবং 'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা' গঠনের দাবি জানায়। তারা, স্ব-পরিচালিত জাতীয়-উন্নয়ন প্রকৌশলের সঙ্গে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ আত্ম-স্বনির্ভরতা অর্জনে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য সহায়ক ভূমিকা পালন। আত্ম স্বনির্ভরতা উন্নয়নের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, জাতীয় উন্নয়নে বিদেশীয় প্রকৌশল প্রয়োগ করা হলেও তার লক্ষ্য হবে দেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন পূরণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আত্ম-স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়টিকে পুষ্ট করেছিল চীনের দ্রুত অগ্রগতি এবং মহাত্মা গাঁন্ধী, মাও জে দং, পাওলো ফ্রেইরি প্রমুখের রচনা।

সম্প্রতি দিল্লীর 'ডেভেলপিং স্টাডি সোসাইটি' সেন্টারের পরিচালক রজনী কোঠারী উন্নয়নে আত্ম-স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়টিকে এক নতুন আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির ইতিবাচক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে এই উন্নয়ন প্রয়োজন।

৬.৫ স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (সাইট)

১৯৬৭ সালের তৎকালীন ভারত সরকারের সহযোগিতায় ইউনেস্কোর এক বিশেষজ্ঞ 'স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট' বা সংক্ষেপে 'সাইট' (SITE) প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। এই কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় উন্নয়নে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহের ভূমিকা খতিয়ে দেখা। ১৯৭৫ সালের ১-লা আগষ্ট থেকে শুরু হয় উপগ্রহের সাহায্যে ভারতের ২৪০০ গ্রামে শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠান প্রচার।

এক বছরের জন্য ঐ উপগ্রহটি ধার করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ১৯৭৬ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন চার ঘন্টা করে সাইট অনুষ্ঠান হোত। এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হোত দিল্লির আর্থস্টেশন থেকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির রিসিভারে।

অনুষ্ঠানের ধরণ ঃ—

প্রচারিত অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর। অনুষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা এবং তার নির্মাণ হোত দিল্লী, হায়দ্রাবাদ (চেন্নাই) এবং কটকে অবস্থিত অল্ ইন্ডিয়া রেডিও-র প্রোডাকশন সেন্টারে। এতে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ এবং বিভিন্ন সমাজসেবী।

অনুষ্ঠানসূচী — স্কুলটেলিকাস্ট ঃ

এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল পাঁচ থেকে বার বছরের শিশু এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিদিন দেড়ঘন্টা করে এই অনুষ্ঠান প্রচার করা হোত এবং ঐ সময়ের মধ্যে বাইশ মিনিট ধরে চলত তেলেগু, কানাড়া ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষার প্রচার।

এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল স্কুল শিক্ষা সম্পর্কে শিশুমনে আগ্রহ সৃষ্টি, স্কুল ত্যাগরোধ করা এবং শিশুমনের প্রাথমিক ধারণার বিকাশ সাধন।

কৃষি অনুষ্ঠান ঃ

অনাবাদী জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার পদ্ধতি, পোলট্রি, পশুপালন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষিমন্ত্রক এই অনুষ্ঠান শুরু করে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হোত আবহাওয়া ও পণ্যের বাজার সম্পর্কিত তথ্য। চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রচার করা হোত কৃষি ও কৃষকের সাফল্যের কাহিনীও।

স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান ঃ

স্বাস্থ্য ও প্রসূতি পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা হোত এই অনুষ্ঠানে।

পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠান ঃ

পরিবার পরিকল্পনা ছিল সাইটের বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ইতিবাচক সাফল্য না পেলেও অনেকে মনে করেন, এক বছরের জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান কাঙ্খিত সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাইট প্রকল্পের সাফল্য দেখে ঠিক হয় সাইট কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত গ্রাম গুলিতে টেলিভিশন কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হবে। ১৯৭৭—৭৮ সালের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে জয়পুর, রায়পুর, মজঃফরপুর, সম্বলপুর, হায়দ্রাবাদ ও গুলবার্তায় ট্রান্সমিটার বসানো হয়। শিক্ষামূলক কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ কর্মসূচী The Indian National Satellite (INSAT) রচিত হয়েছে।

৬.৬ খেদা (Kheda) যোগাযোগ পরিকল্পনা (Project)

আমেদাবাদের 'স্পেশ অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'খেদা যোগাযোগ পরিকল্পনা' ইতিবাচক সাফল্য লাভ করেছে। অথচ এই কর্মকান্ড চালু হয়েছিল 'সাইট' পরিকল্পনার সময়কালেই। খেদা হচ্ছে গুজরাটের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা।

খেদা প্রকল্প ঃ

খেদা জেলার ৪৪৩টি গ্রামে ৬০৭টি কমিউনিটি টেলিভিশন বসান হয়। টেলিভিশন গুলির মালিকানা কমিউনিটিদের হাতে থাকলেও তদারকি করত রাজ্য সরকার। দুধ বিক্রয়কেন্দ্র কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িগুলিতে এই টি.ভি.-সেট বসানো হয়।

অনুষ্ঠান ঃ

প্রতিদিন একঘন্টারও বেশি অনুষ্ঠান প্রচার করা হোত। অনুষ্ঠান প্রচার করতো দূরদর্শন এবং স্পেশ অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার। জেলার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন থেকে নানা উপাদান, উপকরণের ভিত্তিতে তৈরি করা হোত ওই সব অনুষ্ঠান এবং প্রচলিত স্থানীয় ভাষায় সেগুলি প্রচার করা হোত। অস্পৃশ্যতা, ন্যূনতম পারিশ্রমিক, শোষণের

বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগ — ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হোত। সপ্তাহের বিশেষদিনে প্রচারিত হোত মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান। 'দাদি-মা-নি-ভাটন', অর্থাৎ বয়স্কা বৃদ্ধার অভিজ্ঞতার কথা 'হুন-নে-সারা-আষি' (আমি এবং আমার স্বামী), এবং জাগি-নি-জাম-তু' (যখন আমি জাগি এবং দেখি) — ইত্যাদি ছিল বিশেষ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এছাড়া, গুরুত্ব দেওয়া হোত 'কুসংস্কার দূরীকরণ', অপব্যায়, বালিকা বিবাহের কুফল এবং নতুবা ধারণা প্রদান মূলক বিষয়গুলির উপর।

সাফল্য ঃ

একদশক ধরে চারটি পরিদর্শক দল খেদা জেলার সাফল্য খতিয়ে দেখতে শুরু করে। তাদের রিপোর্টে লক্ষ্য করা গেছে যে, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অনেক বেশি সচেতনতা লাভ করেছে। সমালোচকদের মতে টেলিভিশন গুলিতে মহিলাদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়না। কিন্তু খেদা পরিকল্পনায় তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ায় এই ইতিবাচক সাফল্য আসে। খেদা প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র তথ্য প্রদান এবং সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল না, একই সঙ্গে তারা কৃষি, স্বাস্থ্য এবং পশুপালন দপ্তরগুলির সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করেছিল এবং সে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেছিল।

৬.৭ সারাংশ

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়েণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ। বিভিন্ন বিষয় ও দিক বিবেচনার রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ যেমন জরুরী, তেমনি ইতিবাচক সাফল্য অর্জনে পরিকল্পনার যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মে জনগণের অংশগ্রহণও একটা শর্ত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ, পরিকল্পনা, পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা দরকার। অর্থাৎ গণজ্ঞাপন সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা পরিকল্পনারই একটা অংশ। এ সম্পর্কে পশ্চিমী ধারণা তথা ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম ও বিকল্প প্যারাডাইম-এর বিষয়টি চলে আসে। ডমিন্যান্ট প্যারাডাইমের কথা হল তথ্যের একমুখী প্রবাহ। তারাও গৃহীত 'সাইট', বা 'খেদা প্রকল্প' গুলির কিছু ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইতিবাচক দিকও রয়েছে।

৬.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত নোট ঃ—

১. উন্নয়ন বার্তা

২. উন্নয়নে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

৩. উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ—

১. জ্ঞাপন ও উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২. ডমিন্যান্ট প্যারাডাইসে বলতে কী বোঝায়?

৩. বিকল্প প্যারাডাইসের মূল বক্তব্যগুলি কী কী?

৪. উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১. উন্নয়নে জ্ঞাপন বা যোগাযোগ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা কর।

২. যোগাযোগের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক আছে কী যুক্তি দাও।

৩. উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি কী কী?

৪. দেশের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট দেশের গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা কি ধরনের ভূমিকা পালন করে?

৫. 'সাইট' ও 'খেদাপ্রকল্প' আলোচনা কর।

৬.৯ পরিভাষা

■ Message—বার্তা ■ policy—নীতি ■ folkmedia—লোকগণমাধ্যম ■ Community—গোষ্ঠী ■ Alternative Paradigm—বিকল্প প্যারাডাইম ■ Self-reliance—আত্মনির্ভরশীলতা ■ Project—পরিকল্পনা

৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ ঃ—

১. গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২. Mass Communication in India — Keval J. Kumar

৩. Diffusion of Innovation — Everett M. Rogers.

৪. International Encyelopedia of Communication (Vol-2) — Barnouw, Gerbner, Schramm, Worth & Gross.

৫. Beyond Dependency . The Developing World Speaks Out — ElizaFox de Cardona & Hector Schmucler.

৬. Communication for Development in the Third World — Melkote Steeves.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. Communication Development — Everelt M. Rogers.

২. Mass Media & National Development — Wilbur Schramm.

৩. Paradigm Lost — Majid Teharanian.

৪. The passing of modernity — Hamid Mowlana

৫. Communication policy for national development — Majid Teheranian.

৬. The Passing of Traditional Society — Daniel Lerner.

৭. Communication for development — Kunwar B. Mathur.

একক ৭ □ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কি?

৭.৩ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চর্চার বৃদ্ধি

৭.৪ আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন ও চ্যানেল

৭.৫ কতৃত্বকারী ভূমিকায় কারা?

৭.৬ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক যোগযোগ

৭.৭ সারাংশ

৭.৮ অনুশীলনী

৭.৯ পরিভাষা

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭.০ উদ্দেশ্য

গণজ্ঞাপন ব্যবস্থায় 'আন্তর্জাতিক যোগাযোগ' এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার পর কিভাবে যোগাযোগ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন, বিতর্ক আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে এবং কিভাবে তথ্য প্রবাহ সংক্রান্ত বিষয় রাজনৈতিক মঞ্চগুলিকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

৭.১ প্রস্তাবনা

আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ সংক্রান্ত বিতর্কে নানা স্তর পর্ব আছে। ঔপনিবেশিক মুক্তিলাভের পর সদ্য স্বাধীন দেশগুলি তথ্য-সম্পদ সম্পর্কে সচতেন হয়ে ওঠে। এতদিন তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ সংক্রান্ত নানা জটিলতা দূরীকরণ ছিল দেশগুলির নিজস্ব মাথাব্যথার বিষয়। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জগঠিত হওয়ার পর তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তাছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির ক্রম-উন্নয়ন এবং উন্নত দেশ গুলিতে তার প্রয়োগ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে। ফলে সে সম্পর্কে চর্চা, গবেষণা ও বিতর্ক শুরু হয় বিভিন্ন স্তরে।

৭.২ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কি?

সংবাদ-লেনদেনের বিচারে দুই বা তার বেশি দেশের মধ্যে তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদান হোল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ (International Communication)। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রাথমিক শর্তই হোল অন্তত দুটি দেশের মধ্যে তথ্য বিনিময়।

৭.৩ আন্তর্জাতিক যোগাযোগের চর্চার বৃদ্ধি

কয়েক দশক পূর্বে স্বল্প পরিসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। প্রথম সারির মার্কিনী সমাজবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশাবলী (Directives) তৈরি করে। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঠান্ডাযুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল এর অন্যতম কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নীতিও তৈরি করেছিলেন ওই সমাজ বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তার বিন্যাস সম্পর্কে তেমন স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি। কারো কাছে এই যোগাযোগ ছিল প্রচারের ইস্যু। আবার কেউ কেউ মনে করতেন এটা শিক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয় ইস্যু।

বিভিন্ন কারণে গবেষণা, নীতিনির্ধারণ চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত চর্চা বৃদ্ধি পায়। গুরুত্বপূর্ণ কারণ (Factors) গুলি উল্লেখ করা হোল —

১) ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার পর্বে ফটোগ্রাফির উন্নতি, টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মধ্যে সাবমেরিন যোগাযোগের প্রতিষ্ঠা।

২) ইউরোপীয় রাজনীতি এবং তাদের ব্যবহৃত যোগাযোগ প্রযুক্তি গুটি কয়েক পশ্চিমী সংস্থার জন্ম এবং বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ এবং উপনিবেশ গঠন প্রক্রিয়া।

৩) শিল্পায়ণ এবং ইউরোপীয় করণের পাশাপাশি আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আরবের সমাজগুলির পশ্চিমীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা। ইউরোপের দেশগুলির পশ্চিমীকরণ এবং ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া আধুনিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। যেমন— প্রেস, সংবাদসংস্থা, বেতার, গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোষ্ট বা ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (PTT) মন্ত্রালয় ইত্যাদি।

৪) আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (International Telecommunication Union), আন্তর্জাতিক পোষ্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union) ইত্যাদি সংস্থার উদ্ভব এবং তাদের কাজের আন্তর্জাতিয়করন। গড়ে ওঠে রাষ্ট্র সংঘ।

৫) আন্তর্জাতিক পশ্চিমী সংবাদ সংস্থার পাশাপাশি জাতীয় সংবাদ সংস্থার গঠন প্রক্রিয়ার শুরু।

৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও-র বাণিজ্যকীকরণ। সিনেমা, ফিল্ম ইত্যাদির প্রসার ও উন্নতি, ইউরোপে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও উন্নয়ন।

৭) উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং বিভিন্ন ইসলামীয় আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক আদর্শের প্রসার। এছাড়া ইরান, মেক্সিকো, পূর্ব ইউরোপ এবং তৎকালীন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দেশগুলিতে ঘটতে থাকা বিপ্লবী

আন্দোলন এবং সারা বিশ্বে তাদের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।

এতো গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের কথা। ঠান্ডা যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রেক্ষাপটও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সেগুলি হোল —

১) টেলিভিশন, উপগ্রহ (Satelites), কম্পিউটার, ভিডিও, ফ্যাক্সেমেশিন, ডিজিট্যাল সার্ভিস ইত্যাদি নতুন প্রযুক্তি যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে গুণগতভাবে বদলে দেয়।

২) নানা দেশে ঔপনিবেশিক মুক্তি প্রক্রিয়া বহু স্বাধীন দেশের জন্ম দেয়। সদ্য স্বাধীন এই দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তাদের সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মহুমুখী সুযোগসুবিধা সম্পর্কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে তারা প্রশ্ন তোলে।

৩) কূটনীতি, বিদেশনীতি, অ্যজেণ্ডা — ইত্যাদি প্রচারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক যোগযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের দাবি জানায়।

৪) আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানে ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য (imbalance & inequilities) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৫) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থা গঠনের দাবি।

৭.৪ আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন ও চ্যানেল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদ লেনদেনের চেহারাটাই বদলে গেছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের হাত ধরে গণমাধ্যম ব্যবস্থাতেও দেখা দেয় নানান পরিবর্তন। এই মাধ্যমগুলি হোল—

প্রযুক্তিগত মাধ্যম ঃ

১) স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ চ্যানেল, কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং সাবমেরিন কেবল যোগাযোগ।

মুদ্রণ মাধ্যম ঃ

২) **সংবাদপত্র** — 'দ্যা টাইমস্' (লন্ডন), মার্কিন ম্যাগাজিন 'টাইম', 'ওয়াশিংটন পোষ্টে' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ইত্যাদি বড় বড় সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনগুলির আন্তর্জাতিক স্তরে সংবাদও তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বই ঃ

'হার্পার কলিনস', 'টাইম লাইফ বুকস্', 'হাইপেরিয়ন বুকস্', 'চিলটন পাবলিকেশনস্' 'সিমন অ্যান্ডকাস্টার', 'ম্যাকমিলান'—ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশদের বই বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে।

এছাড়া, 'টি.ভি.গাইড', 'টাইম', পিপল্', স্পোর্টস ইলামস্ট্রেটেড' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক স্তরের ম্যাগাজিনগুলি তো আছেই।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঃ

৩) রেডিও, টেলিভিশন, 'ডিরেক্ট-টু-হোম-সার্ভিস' ইত্যাদি মাধ্যম ও চ্যানেল।

৪) ফিল্ম, রেকর্ডিংস, ভিডিও, বিজ্ঞাপন এবং কূটনৈতিক স্তরের মতামত বিনিময় আন্তর্জাতিক জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

৫) 'ডাক ও তার' ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রয়েছে দূরসঞ্চার সার্ভিস ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে দেশে বিদেশে বিভিন্ন 'ফার্ম' গড়ে উঠেছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে 'ইউ.এস.ওয়েস্ট', 'বেল-সাউথ', এ. টি. অ্যান্ড টি. ইত্যাদি।

সরকারি ও ব্যাক্তিগত যোগাযোগ ঃ—

৬) ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দেশে পড়াশুনা সংক্রান্ত যোগাযোগ। সাংস্কৃতিক ও শিল্প জগতে যুক্ত ব্যক্তিরা নানা দেশে অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন। এগুলি ছাড়াও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

৭) মিলিটারি প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, সম্মেলন প্রভৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক স্তরে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মারফত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

৮) রাষ্ট্রগুলির সম্প্রদায়গত যোগাযোগ এবং ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়েও গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক স্তরের এই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্য ও সংবাদ প্রবাহ লিখিত, মৌখিক অথবা ডাটা ভিত্তিক হতে পারে।

৭.৫ কর্তৃত্বকারীর ভূমিকায় কারা?

আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তথ্য ও সংবাদ লেনদেনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলির আধিপত্যবাদ এবং সংবাদের বিষয়বস্তুতে গুণগত বৈষম্য অনেকের মতে মাধ্যম সাম্রাজ্যবাদ। আবার কারো মতে 'মিডিয়া কলোনিয়নিজম' বা গণমাধ্যম-ঔপনিবেশিকতাবাদ। প্রকৃত পক্ষে মার্কিন সংবাদ সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ.পি.), ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা 'রয়টার্স' (Reuters), এবং ফরাসী সংবাদ সংস্থা 'এজেন্স ফ্রান্স প্রেস' (এ.এফ.পি.) তৃতীয় বিশ্ব তথা সারা বিশ্বে সংবাদ লেনদেনে আধিপত্য বজায় রাখছে।

সংবাদ সংস্থা ছাড়াও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিন্যাস ব্যবস্থায় ভাগ বসিয়েছে বহু পশ্চিমী বহুজাতিক সংস্থা। বাণিজ্যিক সাফল্যই তাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য।

এদের মধ্যে হল, টাইম ওয়ার্নার, ভিসনে, কার্টেলস্ম্যান, ভায়াকম এবং নিউজ কর্পোরেশন। নিউজ কর্পোরেশন, টাইম ওয়ার্নারা, ডিসনে এবং ভায়াকম — এদের রয়েছে বড়মাপের ফিল্ম ও টেলিভিশন সংক্রান্ত প্রোগ্রাম তৈরি ও তা সম্প্রচারের পরিকাঠামো। এদের পরেই রয়েছে পলিগ্রাম, সিয়াগ্রাম, সনি এবং জেনারেল ইলেকট্রিক।

অধুনা আমেরিকাবাসী রূপার্টমার্ডক (Rupert Murdoch) পরিচালিত নিউজ কর্পোরেশন ফিল্ম, খেলাধূলা, এমনকি শিশুসংক্রান্ত অনুষ্ঠান — প্রতিটি ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভায়াকমের প্রধান কর্তা সামনার রেজস্টানের ভাষায়, 'মার্ডক আসলে বিশ্বকেই জয় করতে চায়'।

বহুজাতিক সংস্থার আঁতাত (Holding) ঃ

বহুজাতিক সংস্থাগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্ব নিয়ে গণমাধ্যম ব্যবস্থায় গড়ে তুলেছে আন্তর্জাতিক আঁতাত। এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল —

নিউজ কর্পোরেশন ঃ

- ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকায় অন্তত ১৩২টি সংবাদপত্রের অংশীদার।

- টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স — ফিল্ম, টেলিভিশন এবং ভিডিও প্রোগ্রাম উৎপাদক সংস্থা।
- টি.ভি.গাইড সহ আরো এগারটি ম্যাগাজিনের অংশীদার।
- হার্পার কলিন্স সহ অন্যান্য পুস্তক প্রকাশনার অংশীদার।
- জার্মানীর 'ভক্স' চ্যানেলে রয়েছে ৪৯.৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব।
- পঞ্চাশ শতাংশ অংশীদার চ্যানেল 'ভি'-র
- ভারতীয় 'স্কাই ব্রডকাস্টিং ডিজিটাল স্যাটেলাইট সার্ভিস'-র ও অংশীদার নিউজ কর্পোরেশন।

এগুলি ছাড়া 'টাইমওয়ার্নার', 'ভিয়াকম', গ্লোবো', বি.বি.সি., কার্লটন, টেলিভিসা — ইত্যাদিতে রয়েছে তার অংশীদারিত্ব।

৭.৬ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

ভবিষ্যতে মানব জাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। মূলত রাজনৈতিক সংগঠন হলেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এই সংগঠনের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তেমন ইতিবাচক সাফল্য না পেলেও বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা আলোচনাচক্র ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন সতর্কতা সৃষ্টি করে। তৈরি করেছিল এক সচেতন আবহাওয়া।

সংস্থা গঠন প্রক্রিয়া ঃ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা দেশে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন সংস্থা গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্টার ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জার্নালিষ্ট এবং এর পিছনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ইন্টার ন্যাশানাল স্পোর্টিং প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ইন্টার ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর পিরিয়ডিক প্রেস এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গৃহীত উদ্দেশ্য ঃ

১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ অর্থাৎ সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের প্রাক্ ভাঙন পর্বে অন্তত সাতটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। যার বিষয় ছিল প্রেস, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বশান্তির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জের সভায় বিশ্বশান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বিপন্ন দেশের প্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবনায় বলা হয় যে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৯২৭ সালে জাতিপুঞ্জের কাউন্সিল প্রেস বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদসংস্থা সংবদপত্র, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং ৩০টি দেশের প্রেস ব্যুরোর ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন এই সম্মেলনে।

অন্যান্য সম্মেলন ঃ

কোপেন হেগেন সম্মেলন ঃ ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন ছিল পার্লামেন্টাল প্রেস ব্যুরো এবং বিভিন্ন প্রেসের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে জাতিপুঞ্জ বিকৃত তথ্যপ্রবাহ রোধ এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে।

মাদ্রিদ সম্মেলন ঃ

১৯৩৩ সালে স্পেনের মাদ্রিদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিকৃত তথ্যপ্রবাহ রোধে একটি প্রস্তাবনা গৃহীত হয় এই সম্মেলনে।

প্রস্তাবনায় আরো বলা হয় ঃ

ক) আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক সন্দেহ, ভুলবোঝাবুঝি হ্রাস করার জন্য খুব দ্রুত এবং সুলভে সংবাদ আদান-প্রদান করতে হবে।

খ) সুস্থ জনমত গঠনের অনুকুল পরিস্থিতির জন্য সকলপ্রকার প্রযুক্তিগত সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা করা জরুরী।

১৯২৬ সালে ওয়াল্টার উইলিয়ামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে জাতিপুঞ্জ অংশ নেয়। এই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিষ্ট'। এরা শুধুমাত্র প্রেস সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার সম্মেলন করার অনুরোধ করে জাতিপুঞ্জকে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯২৬ সালে 'আই.এল.ও.'-কে কর্মরত সাংবাদিকদের কাজের পরিস্থিতি পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়। এ ব্যাপারে 'Condition of work and life of Journalist' শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

প্রস্তাবনায় বলা হয় ঃ

প্রেসের স্বাধীনতা এবং অবাধ ও যথার্থ সংবাদ সরবরাহ গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃত তথ্য পরিবেশন রোধ করা জরুরী। অবাধ ও সুষ্ঠ সংবাদ লেনদেনকে সুনিশ্চিত করার জন্য দ্বিপাক্ষিকও বহুপাক্ষিক চুক্তি জরুরী।

সম্প্রচার ঃ

১৯৩১ সালে জাতিপুঞ্জ Institute for Intellectual Co-operation-কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রেডিও-র ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেয়। Broadcasting and Peace শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। চলতি বহুমুখী চুক্তিগুলির একটা খসড়া করার কথা বলে এই রিপোর্ট।

এছাড়া ১৯৩৬ সালে জেনেভায় আরো একটা সম্মেলন করে জাতিপুঞ্জ। উদ্দেশ্য ছিল শান্তিস্থাপনে সম্প্রচারের ভূমিকা।

৭.৭ সারাংশ

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রাথমিক শর্ত অন্ততঃ দুটি দেশের অংশগ্রহণ। যতদিন যাচ্ছে ততই বিশ্বের প্রতিটি দেশের যৌথসহযোগিতা মূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা স্তরে এবং প্রয়োজনে এই সহযোগিতা জরুরী। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি দেশ জাতীয় স্বার্থে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চর্চায় উৎসাহও দিচ্ছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দুটি স্তরে ভাগ করতে পারি — প্রাক্ উপগ্রহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং উপগ্রহ পরবর্তী আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। অর্থাৎ আজকের দিনে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিন্যাসটা গুণগতভাবে ভিন্নস্তরে প্রবেশ করেছে।

৭.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত নোট ঃ—

১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চ্যানেল, জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ—

১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?

২. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রযুক্তি মাধ্যম গুলি কী কী?

৩. ব্যক্তিগত ও সরকারিস্তরে কিভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে?

৪. ১৯৩৩ সালে স্পেনের মাদ্রিদে গৃহীত প্রস্তাবনাটির বক্তব্য কী ছিল? কেন এই প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছিল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ—

১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? আন্তর্জাতিক যোগাযোগ চর্চা বৃদ্ধির কারণ গুলি ব্যাখ্যা কর?

২. আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমগুলি কীভাবে ভূমিকা পালন করে?

৩. প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা কী ছিল?

৪. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের সাফল্য ব্যর্থতা আলোচনা কর।

৭.৯ পরিভাষা

- International Communication — আন্তর্জাতিক যোগাযোগ
- Directives — নির্দেশাবলী
- Satellites — উপগ্রহ
- Imbalance & inequilities — ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য
- Holding — আঁতাত
- Partner — অংশীদার
- Study — পর্যালোচনা

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

অবশ্য পাঠ ঃ—

১. Transnational Media and Third World development : the structure and impact of imperialism — William H. Meyer

২. Media and the Third World — D. R. Mankekar

৩. One-Way free flow; neo colonialism via news media — D. R. Mankekar.

৪. Whose News? — Rosemar Righter.

৫. Many Voices One World — UNESCO Report (1980)

৬. Encyelopedia of International Communication (Vol.-3) —
Barnouw, Gerbner, Scheremm, Worth and Gross.

৭. Global Information and World Communication — Hamid Mowlana.

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. Crisis in international News — Jim Richstad and Michael H.Anderson.

২. Many Voices One World (UNESCO Report, 1980)

৩. Mass Communication and American empire — Herbert I. Schiller.

৪. The news merchants — Sapru, Somnath.

৫. Electronic Colonialism : the future of international broadcasting and Communication
— McPhail, ThomasL.

৬. The Politics of World Communication — Cees. J. Hamelink.

৭. MAPPING WORLD COMMUNICATION — Armand Mattelart.

একক ৮ □ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

গঠন ঃ

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

৮.৩ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৮.৪ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

৮.৫ জোট নিরপেক্ষ সংবাদপুল

৮.৬ ম্যাকব্রাইড কমিশন

৮.৭ সারাংশ

৮.৮ অনুশীলনী

৮.৯ পরিভাষা

৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রশ্নকে ঘিরে উঠে আসে 'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা', গঠনের দাবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিতে নানা স্তরে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে ওই ব্যবস্থা গঠনের দাবি ক্রমপরিণতি লাভ করে। সেই সকল দাবি এবং নয়া তথ্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা।

৮.১ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় থাকা দেশগুলির তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ ও ছিল ঔপনিবেশিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু সদ্যস্বাধীন দেশ তাদের তথ্যপ্রবাহ বিন্যাসকে ঢেলে সাজাবার জন্য নানা উদ্যোগ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তথ্য-সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে ছিল এক নতুন উপলব্ধি। এদিকে গঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্ব রাজনীতি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশ কোন শিবিরে না গিয়ে গড়ে তোলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং প্রভাব ফেলতে থাকে রাষ্ট্রসংঘের কর্মকান্ডে। নয়া তথ্য ব্যবস্থা গঠনের দাবি প্রথম উঠে আসে এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন থেকেই।

৮.২ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য বিন্যাস' (New International Information Order) গঠনের প্রশ্নে নানা প্রস্তাব উত্থাপন, সম্মেলন, প্রচার পুস্তিকা প্রচার ছিল ১৯৭০ এর দশকের বিশ্বের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে জোরালো দাবি এসেছিল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির পক্ষ থেকেই। আবার এই বছরই যোগাযোগ মাধ্যম জগতে বিশেষ উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেল, যা এই সময় পর্বকে Information Age তথা 'তথ্যযুগ' হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলির কাছে এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে তারা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই দুর্বল নয়, তথ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে (resource) ও দুর্বল এবং এই তথ্যপ্রবাহে একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে পশ্চিমী দেশগুলির। বেশির ভাগ জোটনিরপেক্ষ দেশ তাদেরকে দেখতে লাগল সাংস্কৃতিক উপনিবেশিকতাবাদের শিকার হিসেবে। অর্থনীতি এবং আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এই বোধ উপলব্ধ হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই তথ্যপ্রবাহ ও যোগাযোগ বিন্যাস ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়।

নয়া ব্যবস্থা কী?

নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বা New International Information and Communication Order (NIICO) সংক্রান্ত ধারণার মূলনীতি হলো আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ। গণতন্ত্রীকরণের ধারণার বিকাশে কতকগুলি স্তর পর্ব আছে।

বিতর্কের ক্রমবিকাশ

১৯৭৩ সালে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস গঠন প্রস্তাব তুলে ধরে এবং তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা ওই প্রস্তাব স্বীকৃতি দেয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে এই স্বীকৃতি ছিল এক বড় জয়। কারণ তারা নয়া তথ্য ব্যবস্থা গঠনের দাবির পাশা-পাশি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের দাবিও তুলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জোর দিয়েছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বনির্ভরতার উপর এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আধিপত্যকামিতার নিরসন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনই ছিল এই দাবির মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাই হোক ১৯৭৬ সালে তিউনিসিয়ার অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদ সংক্রান্ত আলোচনা চক্রে তিউনিসিয়ার তৎকালীন তথ্য সংক্রান্ত সচিব মুস্তাফা মাসমোদি যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের দাবি করেন। তাঁর মতে এই ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন রূপ এবং তাঁর দাবি This "decolonization" of information, must lead to a "new order in information materials!" পরবর্তী সময়ে এই দাবিই "a new world information and communication order" বা নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের দাবি উঠল এই প্রথম, যা নয়া তথ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার আধুনিক ভাবনার প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, তিউনিসিয়া আলোচনাচক্র একটা খসড়া কাঠামো (frame work) তুলে ধরে, যার মূল লক্ষ্য পশ্চিমী আধিপত্যকামিতার নিরসন।

ঐ একই বছর কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর (UNESCO) সাধারণ সম্মেলন তথ্য সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করে এবং এই সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে যায় নয়া তথ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নে উন্নত বিশ্বের অবস্থান। তারা 'অবাধ তথ্য প্রবাহ' (Free flow of Information) সংক্রান্ত ধারণাকে তুলে ধরে। আসলে

এই ধারণা 'অবাধ এবং ভারসাম্যমূলক তথ্য প্রবাহ' (Free and balanced inforflow)-র দাবি, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের দাবি, তাকে আড়াল করতে চায়। পশ্চিমী ধারণায় পুষ্ট অবাধ তথ্য প্রবাহ আদতে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক স্বার্থকেই পূরণ করে, উন্নয়নশীল বিশ্বকে নয়।

৮.৩ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা New International Economic Order সংক্রান্ত ধারণার মূলনীতি হোল আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গণস্ত্রীকরণ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক দেশের, তা সে উন্নত বা উন্নয়নশীল যাই হোক না কেন, সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। আর এই লক্ষ্যপূরণে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চলতি বিন্যাসে বা ব্যবস্থায় পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থার একাধিপত্যের নিরসন।

নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবির ক্ষেত্রেও যেমন, নয়া অর্থবিন্যাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তেমনি এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশ গুলি এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রসংঘের মত আন্তর্জাতিক মঞ্চে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি পেয়ে যায় এক বিশেষ মাত্রা।

প্রেক্ষাপট ঃ

১৯৭০-এর দশকে বিশ্বঅর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় পর্বে লক্ষ্য করা গেল যে, তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনিয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমশ উর্দ্ধমুখী। উন্নয়নশীল দেশগুলি পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে আর্থিক সহায়তা নিতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নজরে পড়ল এক বিশাল বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন ঘোষণা করল যে, রাষ্ট্র সংঘের ঘোষিত 'দ্বিতীয় উন্নয়নের দশক' (Second Development Decade) ব্যর্থ এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে এক বিশেষ অধিবেশনে উল্লেখ করে যে, "the current economic order was in direct conflict with current developments in international political and economic relations, ..." এবং এই অধিবেশনেই এক 'অ্যাকশন প্রোগ্রাম'-এর সনদে (Character) গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয় তুলে ধরে। সেগুলি হল — কাঁচামাল ও প্রাথমিক দ্রব্য, আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা ও পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তি সরবরাহ, আন্তর্জাতিক ও ধনতান্ত্রিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদসমুহের সদ্ব্যবহার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে রাষ্ট্র সংঘের ভূমিকাকে আরো জোরদার করে তোলা ইত্যাদি।

ঐ বছরের মে মাসে রাষ্ট্রসংঘের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন (প্যারিস) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়টি ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা New International Economic Order এ পরিভাষাটি (term) রাষ্ট্র সংঘই প্রথম তাদের ঘোষণায় উল্লেখ করে।

রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা, ১৯৭৪ ঃ

রাষ্ট্র সংঘ তাদের ঘোষণায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করে —

"We, the Member of United Nations, ... Solemnly proclaim our united determination to work urgently for the establishment of a new international economic order based on

equity, sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all states, irrespectives of their economic and social system which shall correct inequalities and redress existing injustice, ..." এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূর করে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উন্নত সমাজ তুলে ধরার লক্ষ্যে এই ঘোষণা —

১) তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাস করে। অথচ বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় এই দেশগুলি। চলতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতি অসম্ভব, তা প্রমাণিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সময় থেকেই এই অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও ভারসাম্যহীনতার শুরু। একে দূর করতে হবে।

২) চলতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এই সঙ্গতিহীনতা দূর করতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রে সদ্য স্বাধীন এই দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে।

৩) উন্নয়নশীল দেশগুলি সার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা, যৌথ এবং আত্ম স্বনির্ভরতা এবং নানা প্রকার পরনির্ভরতা (interdepence) সম্পর্কে সচেতন। উন্নয়নের প্রশ্নে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ বিচ্ছিন্ন নয়। উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হোল যৌথ লক্ষ্য এবং তা পালন করা প্রতিটি দেশের অভিন্ন কর্তব্য।

৪) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি উল্লেখ করা হোল —

ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংহতি ও বিষয়ে অপর কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ বা কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করবে না।

খ) আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিটি দেশ সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকারী এবং এব্যাপারে কোন দেশ হস্তক্ষেপ করবে না।

গ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে বিশ্বের প্রতিটি দেশ সমভাবে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা দরকার।

ঘ) বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

ঙ) প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resources) সংরক্ষণ বা তার রাষ্ট্রীয় করণে অথবা মালিকানা হস্তান্তর করণে ব্যবস্থা নেবার অধিকারী।

চ) রাষ্ট্রের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ম-প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ ওই সংস্থার কাজ-কর্ম-পর্যালোচনা করতে পারে বা যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

ছ) কাঁচামাল, অন্যান্য দ্রব্য আমদানি বা রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।

জ) উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (International Monetary System)-কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

ঝ) উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজস্ব বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি বিদেশী আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করে তা ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া জরুরী।

রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণা উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে ছিল এক বড় জয়। কিন্তু তাই বলে নয়া অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি কোন বিশেষ রাষ্ট্রের উন্নতির প্রশ্ন নয়। এদাবির কেন্দ্রেই ছিল এবং রয়েছে বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সেই দিক দিয়ে এ দাবি ইতিবাচক এবং রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি এক বড় উলম্ফন।

৮.৪ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা নাম (NAM)

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাম একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বের ফসল। যে পর্বের সূত্রপাত ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র বনাম ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ছিল দ্বিমেরুকৃত। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়েরপূর্ব পর্যন্ত অন্তত তাই ছিল। দ্বিমেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থায় কোন পক্ষে না গিয়ে স্বতন্ত্র তৃতীয় মঞ্চ হিসাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বিশ্বরাজনীতিতে উঠে আসে।

প্রেক্ষাপট ঃ

১৯৫৫ সালের ১৮-২৪শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুঙ শহরে বসে আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন। চীন, জাপান, ভারত, ভিয়েতনাম গণপ্রজাতন্ত্র, পাকিস্তান সহ এশিয়ার ২৩টি এবং মিশর সহ আফ্রিকার ৬টি দেশ বান্দুঙতে অংশ নেয়। দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই সম্মেলনে। বলা যায় জোটনিরপেক্ষ নীতির 'আংশিক জমাট বাঁধার কাজ সূচিত হয়েছিল' বান্দুঙ সম্মেলনেই। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আফ্রো-এশিয় সংহতি আন্দোলন এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই বিকল্পিত হয়ে ওঠে।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। অংশ নিয়েছিল ২৫টি দেশ। উল্লেখ্য বর্তমানে ন্যামের সদস্য সংখ্যা ১০৮টিরও বেশি দেশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির — এই বিবদমান গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, যাকে বলা হয় দ্বিমেরুকৃত (Bipolar) বিশ্ব ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য এবং ক্রমশবৃদ্ধি ডি-কোলোনাইজেশন বা দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবির সব দিক দিয়েই সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে যুদ্ধ-জোট তো গঠন করছিলই, সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকেও টেনে আনছিল সামরিক জোটের ছত্রছায়ায়। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য মার্কিন উদ্যোগে গঠিত হয় 'সিয়াটো' জোট, ১৯৫১ সালে গঠিত হয় 'আনজাস্'।

আর এই প্রেক্ষাপটেই যৌথ স্বনির্ভরতা ঘোষণাকে সামনে রেখে বিশ্বরাজনীতিতে তৃতীয় মঞ্চ হিসেবে উঠে আসে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। 'জোটনিরপেক্ষ' শব্দটির মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্রবোধের ছাপ স্পষ্ট। আমরা মার্কিন জোটেও নেই, সমাজতান্ত্রিক জোটেও নেই — অনেকটা এরকম ঘোষণায় জোটনিরপেক্ষতাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা।

জোটনিরপেক্ষতার নীতি ঃ

জোটনিরপেক্ষ নীতির ব্যাপারে নির্ধারিত মানদন্ড ছিল —

১) সেই দেশকে স্বাধীননীতি অনুসরণ করতে হবে। যে নীতির ভিত্তি হবে ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহাবস্থান। অনুসরণ করতে হবে জোটনিরপেক্ষতা অথবা অনুরূপ নীতি।

২) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বরাবর সমর্থন জানিয়ে যেতে হবে।

৩) শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত বহুমুখী সামরিক জোটের সদস্য হওয়া চলবে না।

৪) মহাশক্তিধর কোন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলে অথবা আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সন্ধি চুক্তির সদস্য হলে দেখতে হবে, সেই চুক্তি বা সন্ধিচুক্তি যেন মহাশক্তিধর দেশগুলির সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পাদিত না হয়।

৫) দেশের মধ্যে কোন বিদেশী শক্তিকে তাদের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ঘাঁটি করতে দেওয়া যাবে না।

এই নীতিগুলি ছাড়াও প্রথম শীর্ষ সম্মেলন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, স্থায়ী শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ সহ সমস্ত রকম আগ্রাসনের বিরোধীতা করতে হবে।

ন্যামের প্রাসঙ্গিকতা ঃ

১৯৯১-এ প্রাক্তন রাশিয়া বিপর্যয়ের ফলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সামনে বিশ্বরাজনীতির এতদিনের চেনা বিন্যাসটাই বদলে গেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাকে ঘিরে। ১৯৯২-এ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দশমশীর্ষ সম্মেলন শুরু হবার আগে ওই শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'জাকার্তা টাইমস' তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে 'রাজনৈতিক ডাইনোসোর' হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, পরিবর্তিত অবস্থার ন্যাম 'অচল', 'অপ্রাসঙ্গিক'।

কোন সন্দেহ নেই ন্যামের কিছু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও, ঘোষিত নীতি অনুযায়ী একটি ইতিবাচক ও সদর্থক প্রচেষ্টা। উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীন ও সার্বভৌম কার্যক্রমের মধ্যেই এর ভিত্তি। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বাধীন ও সার্বভৌম উদ্যোগ, তা সে যৌথ বা একক যাই হোক না কেন, অপ্রাসঙ্গিক হয় কি করে?

সাম্রাজ্যবাদী চাপ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ওপর সব সময়ই ছিল, ছিল আক্রমণ — মতাদর্শগত ও বৈষয়িক। বিশ্বরাজনীতির বিন্যাসের বদল ঘটলেও আক্রমণকারী থেকে গেছে একই স্থানে, বরং আরও বলিষ্ঠ তার আক্রমণ। তাই সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে এই স্বাধীন ও সার্বভৌম উদ্যোগের ওপর সাম্রাজ্যবাদ যখন আক্রমণ তীব্র করছে, তখন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আরো গুরুত্ব পেয়েছে। আরো আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

৮.৫ জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল

সংবাদ সংস্থাগুলির মারফত আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য ও সংবাদপ্রবাহ সংক্রান্ত আলোচনা জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল (Nonaligned News Pool)-কে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তথ্যও ও সংবাদপ্রবাহে যে পরিমাণগত ও গুণগত বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যেই জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল বা সংক্ষেপে 'পুল'-এর প্রতিষ্ঠা।

পুল কী?

জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল একটা বহুপক্ষীয় উদ্যোগ। তবে পুল কি তা বুঝতে গেলে পুলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিক ডি. আর. মানকেকার (D. R. Mankekar)-এর কথাটি স্মরণ করতে হয়। তার মতে "জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে তথ্যও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাই সংবাদপুল নামে পরিচিত।"

পুলসংবাদ সংস্থা নয় ঃ

জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল 'পি.টি.আই.' (P.T.I.) 'ইউ.এন.আই. (U.N.I.), 'রয়টার্স' (Reuters), বা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (API)-এর মত কোন সংবাদ সংস্থা নয়। কেন না, সংবাদ সংস্থাগুলির মত এর কোন কেন্দ্রিয় সদর দপ্তর নেই, কোন জেনারেল ম্যানেজারও নেই। এমনকি আর্থিক বাজেট এবং কর্মচারীও নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই পুলের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে রয়েছে পুলের কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। তিন বছর অন্তর তাঁর পরিবর্তন হয়।

কেন এই পুল?

যে লক্ষ্য ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিকশিত হয়েছে, তার সূত্র ধরেই জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুলের জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলি অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দুর্বলতার পাশাপাশি তথ্য ও সংবাদ প্রবাহ ব্যবস্থার স্তরেও পিছিয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি আত্ম-স্বনির্ভরশীল হওয়ার প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর যুগোশ্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন এক ঘোষণা বলে —

"We are fighting for collective self reliance" অর্থাৎ যৌথ স্বনির্ভরতার জন্য আমাদের এই লড়াই। যৌথ স্বনির্ভরতা অর্জন এবং পরস্পরকে স্বনির্ভর করে তোলাই আমাদের পারস্পরিক লক্ষ্য। স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে যৌথ কর্মকান্ড।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে উন্নয়নের প্রশ্নে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে যোগাযোগও তথ্যপ্রবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি। তথ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অভাব দেশগুলির কাছে দারিদ্র্যতার নতুন অর্থকে তুলে ধরে। এছাড়া, পশ্চিমী-মার্কিনী সংবাদ সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যে সংবাদ পাঠায় তার সত্তর শতাংশই উন্নত দেশ সংক্রান্ত। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির সংবাদ সেখানে ব্রাত্য। শুধু তাই নয়, সরবরাহকৃত সংবাদগুলি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির তথ্যমন্ত্রীরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। ঐ সম্মেলন স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছিল যে, চলতি তথ্যব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা দূর করা এবং যৌথ স্বনির্ভরতা অর্জনে পরস্পরের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য এই সম্মেলনই পুলের কার্যক্রমের খসড়াপত্র গৃহীত হয় এবং একই বছরে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জোটনিরপেক্ষশীর্ষ সম্মেলনে সেটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সংবাদ সংস্থা তানজুং (Tanjung) ১৯৭৫ সালে দশটি অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মাধ্যমে পুলের কাজ শুরু করে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সাংবিধানিক তত্ত্বাবধানেই পুলের কাজ কর্ম পরিচালিত হয়।

সংবাদ পুলের লক্ষ্য ঃ

পুলের সংবিধানের লক্ষ্য হিসেবে ৫-টি বিষয়ের উল্লেখ আছে —

১) জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংবাদ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও উন্নত করা।

২) পুলের মূল প্রতিশ্রুতিই হোল বস্তুনিষ্ঠ (objective) সংবাদ বিষয়ে জোর দেওয়া। একই সঙ্গে প্রগতিমূলক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মপ্রয়াসের উপর জোর দেওয়া।

৩) সংবাদপুল তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক জনসমাজে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদ আদান-প্রদান করতে চায়।

৪) জোটনিরপেক্ষ দেশ এবং তাদের নীতিসম্বন্ধে আরো তথ্য প্রদান করে পুল এক্ষেত্রে ফাঁকপূরণ করতে চায়। আগ্রহী সংবাদসংস্থা, প্রচার মাধ্যম গুলিকেও সংবাদ দিতে আগ্রহী পুল।

৫) আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা গঠনের মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে চলতি সংবাদ বিনিময় ব্যবস্থাকে পুল বদলাতে চায় না। কিন্তু উপরোক্ত লক্ষ্যপূরণই তার কাজ।

পুল তিনটি ফাঁক পূরণ করতে চায় ঃ

১) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পরস্পরের খবর জানতে পারেনা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আমরা লন্ডন, নিউইয়র্ক, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের খবর যতটা জানি, পাশের বার্মা (মায়ারমান), মালদ্বীপ, মরিশাস অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলির সংবাদ ততটা জানিনা। কারণ এগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংবাদ সংস্থার তেমন যোগাযোগ নেই। 'পুল' এই যোগাযোগ করে দিতে চায়।

২) পশ্চিমী সংবাদ সংস্থা গুলি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সংবাদ প্রচার করে তৃতীয় বিশ্বের এক বিকৃত ভাবমূর্তি তুলে ধরে। পুল এই ভাবমূর্তি বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে দূর করতে চায়।

৩) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি যে ধরনের সংবাদ সরবরাহ করে তা শুধুমাত্র তথ্যগত দিক দিয়ে নয়, দৃষ্টিভঙ্গীগত দিক থেকেও সঠিক নয়। পুল এটি শোধরাতে চায়।

সংবাদ প্রদান কীভাবে হয় ঃ

সংবাদ পুলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংবাদ প্রেরণকারী সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ পাঠানোর খরচ বহন করতে হয়। আবার গ্রাহক সংবাদ সংস্থা সংবাদ যোগ্য মনে করলে তা সংবাদমাধ্যম গুলিকে সরবরাহ করতে পারে। গৃহীত সংবাদ প্রচার বা প্রদান করা না করা একান্তভাবেই সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতির ব্যাপার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলের সংবাদ বিনিময় হয় তিনটি ভাষায় —

(১) ফরাসী, (২) স্প্যানিশ এবং (৩) ইংরেজী।

৮.৬ ম্যাক ব্রাইড কমিশন

১৯৭৬ সালের সম্মেলনেই ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল আমাদো মহতার এম. বো (Amadou Mahtar M'Bow) এক কমিশন গঠনের কথা বলেন এবং এই প্রস্তাবানুসারে ১৯৭৭ সালে আয়ারল্যান্ডের সিয়ান ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে ষোল সদস্যের 'ম্যাক ব্রাইড কমিশন' গঠিত হয়। কমিশনের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয় 'to study —"the totality of communication problems in modern societies' এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব (recommendations) পেশ করা।

১৯৮০ সালে বেলগ্রেড অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর একুশতম সাধারণ সম্মেলনে কমিশন "Many Voices One World" শীর্ষক চূড়ান্ত রিপোর্ট' পেশ করে এবং ঐ সম্মেলন রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি বিচার বিবেচনা করে। উল্লেখ্য, কমিশনের সদস্যরা এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, চলতি তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সামগ্রিক বিচারে আশাপ্রদ নয়।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ওই বছরে এবং কমিশনের রিপোর্টে পেশ করার কয়েকমাস পূর্বে বাগদাদে আয়োজিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ বিন্যাস সংক্রান্ত কয়েকটি নীতি (principles) তুলে ধরে, যা পরবর্তী সময়ে ম্যাক ব্রাইড কমিশনের রিপোর্টেও প্রতিফলিত হয়।

কমিশনের প্রস্তাব এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির দাবি গুলিকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালের সম্মেলনে

ইউনেস্কো এগারটি নীতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। ওই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্রটিকে তুলে ধরা হয়। নীতিগুলি হল —

১) বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্যহীনতা দূরীকরণ করতে হবে।

২) সরকারী, বেসরকারী আধিপত্যকামিতার নিরসন করে এই চলতি কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ জরুরী।

৩) কোন দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বাধাগুলিকে দূর করে অবাধ ও ভারসাম্যমূলক তথ্য, মতামত আদান-প্রাদনের ব্যবস্থাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৪) তথ্য যোগাযোগের মাধ্যম ও চ্যানেল পর্যাপ্ত করে তুলতে হবে।

৫) প্রেসের স্বাধীনতার পাশাপাশি তথ্য জানার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলিকে তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণের উপযোগী করে তুলতে হবে।

৭) এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৮) অন্য দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়কে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিজস্ব স্বার্থ, আকাঙ্খা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।

৯) সমতার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থায় প্রতিটি জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকারকে স্বীকার করতে হবে।

১০) সমাজ ইতিবাচক দায়বদ্ধতা পালনের স্বার্থে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও সাংবাদিকদের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করতে হবে।

১১) নয়া তথ্য ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী গুলিকে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। শ্রদ্ধা করতে হবে তাদের নিজস্বতাকে।

৮.৭ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বিশ্বরাজনীতির বিন্যাসটা বদলে যায়। অর্থাৎ ইউরোপকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতির অবসান ঘটে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়াকে কেন্দ্র করে দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। একে বলা হয় দ্বিমেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি নিয়ে গঠিত হল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় পশ্চিমী দেশগুলির আধিপত্যকামিতা নিরসনের দাবি জানায় তারা। যার মূল বক্তব্য হল যোগাযোগ ও তথ্য বিন্যাসের গণতান্ত্রিকরণ। এই লক্ষ্য পূরণকে সামনে রেখে উঠে আসে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীস্তরে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক মঞ্চ হলেও যোগাযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষ ও দেশগুলি গঠন করে জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল।

৮.৮ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত নোট ঃ**

১. নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, জোটনিরপেক্ষ সংবাদপুল, ইউনেস্কো, ম্যাকব্রাইড কমিশন।

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১. নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবি কেন উঠে আসে?

২. নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নীতিগুলি কি ছিল?

৩. নয়া অর্থনৈতিক দাবির গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪. সংবাদপুল ও সংবাদ সংস্থার পার্থক্য চিহ্নিত কর।

৫. পুলের লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবি কারা এবং কেন তুলেছিলেন?

২. কোন প্রেক্ষাপটে এবং কেন নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা গঠনের দাবি উঠে আসে?

৩. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কি? জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে যুক্তি দাও।

৪. রাষ্ট্র সংঘ কিভাবে নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনের দাবিকে ক্রমপরিণতির দিকে নিয়ে যায়?

৫. পুল কি? কোন কোন লক্ষ্য পূরণকে সামনে রেখে পুল গঠিত হয়?

৮.৯ পরিভাষা

■ New International Information Order — নয়া আন্তর্জাতিক তথ্যবিন্যাস বা ব্যবস্থা ■ Information Age — তথ্য-যুগ ■ Resource — সম্পদ ■ Cultural Colonialism — সাংস্কৃতিক উপনিবেশকতাবাদ ■ Communication Order — যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বিন্যাস ■ framework — কাঠামো ■ Free Flow of Information — অবাধ তথ্যপ্রবাহ ■ Free and balanced information flow — অবাধ এবং ভারসাম্যমূলক তথ্যপ্রবাহ ■ recommendation — প্রস্তাব ■ New International Economic Order — নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা বিন্যাস ■ Second Development Decade — দ্বিতীয় উন্নয়নের দশক ■ Charter — খসড়াপত্র ■ Commonduty — সাধারণ কর্তব্য ■ International Monetary System — আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা ■ Bipolar — দ্বিমেরকৃত।

৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ্য ঃ**

১. "The New World Information Order" in World Communication — Mustapha Masmoudi

২. Global Information and World Communication : New Frontiers in International Relations — Hamid Mowlana.
৩. Encyclopentia of International Commuciation (Vol.-3)
৪. One Way free flow — D. R. Mankekar.
৫. Whose freedom? Whose order — D. R. Mankekar.
৬. Communication, development and the third world — Robert L.Sternson.
৭. News Agencies fool of Non-Aligned Countries — I.I.M.C.

■ **সহায়ক গ্রন্থ ঃ**

১. "Many Voices One World (UNESCO Report, 1980)
২. The Mass Media Declaration of UNESCO — Kaarle Norden Streng.
৩. Crisis In international News — Jim Richstad and Michael Anderson.
৪. Mass Communication in India — Keval J. Kumar.
৫. The Polities of World Communication — Cees J. Hamelink.

একক ৯ □ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ প্রস্তাবনা

৯.২ নানা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কি?

৯.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ বাধা

৯.৪ সারাংশ

৯.৫ অনুশীলনী

৯.৬ পরিভাষা

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করেছেন। বাস্তবত সংস্কৃতির কোন একক পরিচিত নেই। বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত এই সংস্কৃতি। কিন্তু আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারকালচারাল বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক কারণেই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা জরুরি।

৯.১ প্রস্তাবনা

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আজ আমাদের দৈনন্দিন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমায়িত নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাবও প্রসারের হাত ধরে সংস্কৃতি আজ তার গণ্ডী ছাড়িয়ে পৌঁছে যাচ্ছে নানা স্থানে। এ প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে একটি দেশ একক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাস্তবে কিন্তু একটি দেশ নানা মাত্রার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এক দেশ এক সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয় আলোচনার সুবিধার্থে।

৯.২ নানা সংস্কৃতিক যোগাযোগ কি?

ইন্টার কালচারাল কমিউনিকেশন বা নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ হল বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ। সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে একটি জাতি ও দেশ সমার্থক। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটা অংশই হল নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুই বা আর বেশি সংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি হচ্ছে সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ইন্টার কালচারাল কমিউনিকেশন নয়। আবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলা দেশের যোগযোগ — দুটি ভিন্ন দেশ হলেও হলেও ইন্টার কালচারাল কমিউনিকেশন নয়; কারণ উভয় সংস্কৃতি মোটামুটিভাবে এক।

সাংস্কৃতির আদান-প্রদান ঃ

সংস্কৃতি বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা বুঝি গান, বাজনা, নাটক, চলচ্চিত্র, নানা-আঙ্গিকের নৃত্যশিল্প অথবা সংস্কৃতি বলতে বুঝি সংস্কৃত মানুষের আচরণ। অর্থাৎ ভব্যতা, আদাব-কায়দা এবং দেশজ রীতি-নীতি ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংজ্ঞানুসারে মানুষের সমস্ত জীবনচর্চাই সংস্কৃতি।

সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক সত্ত্বাবিশিষ্ট দুই বা তার বেশি দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নানা ভাবে হতে পারে। বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানান আলাপ-আলোচনা, ওয়ার্কশপ, বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিস্তরে চিঠিপত্র ইত্যাদি মারফত নানা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাছাড়া আজকের দিনে টেলিভিশন, উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

কিন্তু নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু পূর্ব থেকেই — দেশে দেশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার হাত ধরেই। সাম্রাজ্যবাদীশক্তিগুলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের চেষ্টা করেনি, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ কয়েম করারও চেষ্টা করে। অর্থাৎ রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ।

৯.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ বাধা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মৌল উদ্দেশ্য কোন সাংস্কৃতিকে গিলে খাওয়া নয়, বরং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উভয় সংস্কৃতিকে আরো উন্নত করা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা। আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বাড়লে সংস্কৃতির বিনিময় হবে উর্দ্ধমুখী।

তবে বর্তমান সমাজে সমস্ত সামাজিক মানুষই যে একই সাংস্কৃতিক বিন্যাস অনুসরণ করবেন তার মানে নেই। একটি সমাজ বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ সাংস্কৃতিক কাঠামোর অঙ্গীকৃত সংস্কৃতি যাকে সহজ সাধারণ সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায় (স্ত্রী আচার, বিবাহবিধি, পূজাপার্বণ, রান্নাবান্না) তাকে বলা হয় উপসংস্কৃতি। প্রতিটি জটিল সমাজই বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এই উপসংস্কৃতির মধ্যে জ্ঞাপন-ভেদ (Communication gap) দেখা দিতে পারে আবার নানান উপসংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতিগত সংঘর্ষও দেখা দিতে পারে। কোন সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কিছু মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে অথবা তার বিরুদ্ধে কিছু কাজকর্ম করতে পারে। যেমন বহু ব্যক্তি "অশ্লীলতাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন ও তাকে জীবনের অঙ্গ বলে মনে করেন। অথবা প্রচলিত সাংস্কৃতিক অর্থে যা অশ্লীল তাদের চোখে তা অশ্লীল নয়, এই প্রথা বিরোধিতা করলে প্রতিসংস্কৃতি (Counter-Culture)।

৯.৪ সারাংশ

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আন্তর্জাতিকস্তরে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটা অংশ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা মাত্রার, বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে একটা পৃথক অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আলোচনায় একটি দেশ একটি সংস্কৃতির পরিচায়ক — এই সরল নথিকরণ মেনে চলা হয়। যদিও বাস্তবতা অন্য কথা বলে।

৯.৫ অনুশীলনী

■ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১. সাংস্কৃতিক বা ইন্টার কালচারাল যোগাযোগ কি?

২. সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সম্পর্ক কি?

৩. সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়?

■ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১. "আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আসলে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ"—বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও।

২. সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কি কি ধরনের বাধা আসতে পারে?

৩. আধুনিক গণমাধ্যম গুলি কিভাবে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলে? সাম্প্রতিক চিত্রসহ আলোচনা কর।

৯.৬ পরিভাষা

■ Intercultural Communication — সাংস্কৃতিক যোগাযোগ/নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ ■ Counter Culture — প্রতিসংস্কৃতি ■ Communication Gap — জ্ঞাপন ভেদ।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

■ **অবশ্য পাঠ্য ঃ**

১. গণ জ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২. The Cultural barriers; problems in the exchange of ideas : — Daniel, Norman.

৩. Handbook of international and intercultural Communication — edited by Molefi Kete Asante, William B. Gudykunst.

৪. Global Work : bringing distance Cultural and time — O'Hara-Deveroux, Mary.

৫. Theories in intercultural Communication — edited by Young YunKim & William B. Gudykunst.

■ **সহায়ক গ্রন্থ ঃ**

১. Intercultural Communication Theory : Cultural perspective — William B.Gudykunst.

২. Mass media polieies in changing cultures — George Gerbner.

৩. Tretition as truth and communication — Pased Boyer.

৪. Mass Communication Theory — Denis Mc.Qual.

একক ১০ □ সংস্কৃতি ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি

গঠন ঃ—

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ প্রস্তাবনা

১০.২ লোকসংস্কৃতি

১০.৩ গণমাধ্যম

১০.৪ জ্ঞাপন মাধ্যম ও গণমাধ্যম

১০.৫ গণসংস্কৃতি

১০.৬ বিশ্বায়ণ—তথ্যবিনোদন, নতুন প্রযুক্তির প্রভাব

১০.৭ সারাংশ

১০.৮ অনুশীলনী

১০.৯ পরিভাষা

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১০.০ উদ্দেশ্য

প্রতিটি দেশে নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। সেগুলি দেশজ সংস্কৃতি অর্থাৎ দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জীবনবোধের প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টসংস্কৃতি। দেশজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সেই দেশের সম্পদ। এই বৈচিত্র্য দেশের পরিচিতিকে বহন করে। কিন্তু আজ প্রতিটি স্তরে বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার থেকে রেহাই পাচ্ছেনা সংস্কৃতি। অভিন্ন বাজার তৈরির প্রবণতা ক্ষতিগ্রস্থ করছে দেশজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে। এখানে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

১০.১ প্রস্তাবনা

লোকসমাজে মানুষে মানুষে একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। যে সমাজে ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া হোত সব চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য ও চিরাচরিত মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই সমাজের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। দেশের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ যেমন সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে সংস্কৃতি একটি রূপ পায়। অর্থাৎ সংস্কৃতি দেশের চরিত্রকে তুলে ধরে। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃতিকে পণ্যায়ণ শুরু হয়েছে। পশ্চিমী গণমাধ্যম গুলিতে তো বটেই, এমনকি দেশীয় গণমাধ্যম গুলিও তথ্যবিনোদনের প্রবণতাকে উস্কে দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে একটি ভোগবাদী প্রবণতা।

১০.২ লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী যৌথ সমাজে তার জন্ম। তখন স্রষ্টা ও উপভোক্তাদের মধ্যে তফাত ছিলনা বললেই হয়। যখন মানুষ লিখতে শেখেনি তখনও সে ভাবতে পারত এবং প্রকাশ করতে জানত সেই ভাবনাকে নানাভাবে। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি সমাজ-প্রক্রিয়ারই অংশ, স্বয়ং একটি প্রক্রিয়াই।

লোকসংস্কৃতির লক্ষণ ঃ

১) লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা বা উৎস যাই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তা পরিণত হত সামাজিক সম্পত্তিতে।

২) স্রষ্টা ভোক্তার মধ্যে ঘনিষ্ট অবস্থানগত সম্পর্ক, ফলে সৃষ্টির রূপ ও ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হত না।

৩) মানসিক শিল্পগুলিকে (অর্থাৎ গান, নাচ, লোককথা, রূপকথা, লোকনাট্য, লোককবিতা, লোকশিল্প) পণ্য ও দর্শক-তোষক পারফরম্যান্স হিসেবে গণ্য না করা।

৪) বিষয় বা ভাববস্তুতে কালযোগী অদলবদল ঘটলেও রচনা সংগঠনের মূল আদলটির রক্ষণশীলতা — ভাদু-তুষুর গানে বা গম্ভীরাতে যেমন লক্ষ্য করা যায়।

৫) রিচুয়াল বা আচার অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, শিশুকে ঘুমপাড়ানো গান, বিয়ের গান, ধান ঝাড়াই বা ছাদ-পিটানোর গান ইত্যাদিতে লোকসৃষ্টি প্রয়োগের সম্পর্ক বর্তমান।

লোকসংস্কৃতির মূল্য ঃ

লোকসংস্কৃতি সমাজের আরোপিত নয়। গোষ্ঠীজীবনের বা প্রান্তীয় জনসমাজের অলিখিত ইতিহাস লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির মধ্যে নিহীত রয়েছে গোষ্ঠীর বিশ্বাস, ধর্মীয়তা, নানা সামাজিক নিয়মনীতি। ইতিহাসবিদ্‌রা লোকসংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করছেন ইতিহাস রচনায়। লোককথা, পূরাণ, আচার-অনুষ্ঠানের পরম্পরা যে ইতিহাস চর্চার মূল্যবান উপাদান হতে পারে তা বলছে তাঁরা যাঁরা লিখছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস।

ইদানিংকালে অপসংস্কৃতি দূরীকরণে লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ, পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে।

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

লোকসংস্কৃতির পিছনে কোন বাণিজ্যিক প্রয়াস নেই, তা ব্যক্তির মানসলোকে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়। কিন্তু গণ-সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানকেও গণবিনোদনের বিষয়বস্তু করে তোলে। আজ লোকসংস্কৃতি তার সংহত গ্রামীণ আবাস ছেড়ে পৌঁছে যাচ্ছে বৃহত্তর ক্রেতা-সমাজের কাছে। হয়ে উঠছে প্রদর্শন ও বিনোদনের পণ্য। দ্রুত বদলের হাওয়া লেগেছে তার গায়ে।

তার নানা বস্তু ও সৃষ্টি মিডিয়া বা গণমাধ্যমগুলির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে দেশের বহু জনসমাজের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় সংস্কৃতি ব্যবসায়রা তার উৎপাদন বা পরিবেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ বসাতে চায়। লোকসংস্কৃতির স্রষ্টারা লাভ-সচেতন হয়ে ওঠেন, সেই সঙ্গে প্রদর্শন-নির্মাণ-পরিবেশনের প্রযুক্তিও তাদের প্রভাবিত করে।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলির কাছে যে সংস্কৃতি রয়েছে তা প্রতিটি দেশের সম্পদ। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসার

ও প্রভাবের ফলে লোকসংস্কৃতির ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিত্তিক বৈচিত্র্যের ঘরানা বদলে যাচ্ছে। এই বদলের অর্থ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি নয় বরং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বময় সাধারণ বাজার তৈরি করছে। সাংস্কৃতিক এই অভিন্নতা বিভিন্নতাকে গৌণ না করে পারে না। গণসংস্কৃতি আসলে বাজারী সংস্কৃতি, ছাঁচে ঢালা সংস্কৃতি। পণ্যায়ণ তার ফল।

১০.৩ গণমাধ্যম

গণজ্ঞাপনের ভাষায় জনগণ বলতে আমরা বুঝি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরাট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত জনসমষ্টি। বিচ্ছিন্ন এই জনসমষ্টির কাছে যার মারফত একই বার্তা (Message) পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় তাকেই বলা হয় গণমাধ্যম (Mass Media)। এই গণমাধ্যম অন্যান্য গণ ভোগ্য পণ্যের মত প্রযুক্তি বিদ্যার দান ও যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত। কিন্তু গণমাধ্যম ও গণ ভোগ্যপণ্য এক নয়, এর নিজস্ব চরিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

গণমাধ্যম আসলে কী?

মাধ্যম বা ইংরাজী 'মিডিয়াম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ — যার দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করা হয় অথবা তথ্য পরিবেশনের উপযোগী সূত্র (a chance for information)। কিন্তু কোন সূত্র মারফত বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কোন কিছু জ্ঞাপন করলেই ওই সূত্রকে গণমাধ্যম বলা যায় না। দেখতে হবে যা জ্ঞাপণ করা হচ্ছে, তা তথ্য, শিক্ষা, ভাবধারা, আবেগ বা বিনোদন কিনা। এই অর্থে বৈদ্যুতিক বাল্ব গণমাধ্যম নয়। যদিও বাল্বকে আলোক মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই আলো কোন তথ্য পরিবেশন করছে না, বহু ব্যক্তির অন্ধকার দূর করছে। তবে এই আলো যখন বিজ্ঞাপনের নিওন সাইন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এই আলো এক ধরনের গণমাধ্যম। অ্যালান হ্যানকক (Alan Hancock) তাঁর 'মাস কমিউনিকেশন' গ্রন্থে লিখছেন, "শুধু একটি টেলিফোন দূরভাষণ যন্ত্রমাত্র। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন দেশের অধিকাংশ লোকেরই টেলিফোন আছে এবং সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের জন্য টেলিফোন ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন টেলিফোন গণমাধ্যম।"

১০.৪ জ্ঞাপনমাধ্যম ও গণমাধ্যম

চিঠিপত্র মারফত আমরা আমাদের সংবাদ বা কোন তথ্য অপর কোন ব্যক্তি বা কিছু ব্যক্তিকে জানাতে পারি। এক্ষেত্রে চিঠিপত্র জ্ঞাপনমাধ্যম, গণমাধ্যম নয়। কারণ চিঠি-পত্রর দ্বারা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে সংবাদ বা তথ্য জানানো হচ্ছে তারা জনসমষ্টি গণ বা Mass-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। এখানে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিরাট ভৌগোলিক ভূখন্ডের অধিবাসী নয়।

কিন্তু আমাদের মেটালিক মাধ্যম, যেমন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মুদ্রণ বা বৈদ্যুতিন মাধ্যম মারফত যখন ওই চিঠি ছেপে বা পড়ে বৃহৎ বিচ্ছিন্ন জনগণের কাছে তুলে ধরা হয় তখন ওই মাধ্যমগুলি গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ গণমাধ্যম হল সেই মাধ্যম যার সাহায্যে কোন বার্তা লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে পরিবেশন করা সম্ভব হয়।

গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য ঃ

তাহলে প্রকৃত গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে —

১) গণমাধ্যম হল এমন মাধ্যম যা যান্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত।

২) যা বিরাট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বৃহৎ জনসমষ্টির কাছে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দিতে সমর্থ।

৩) যে মাধ্যমকে বা মাধ্যম মারফত তুলে ধরা বার্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ বা সঞ্চয় করা সম্ভব।

বিভিন্নপ্রকার গণমাধ্যম ঃ

গণমাধ্যম গুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —

ক) মুদ্রণ মাধ্যম

খ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম

বৈদ্যুতিন মাধ্যম আবার দুই ভাগে বিভক্ত —

ক) শব্দ মাধ্যম

খ) গতি মাধ্যম

মুদ্রণ মাধ্যম (Print Media) ঃ

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, বহুল প্রচারিত বই, পেপার ব্যাক, বিভিন্নপ্রকার প্রচার পুস্তিকা। যথা ফোল্ডার, ব্রোশিয়ার, লিফ্‌লেট, পোষ্টার, স্টিকার ইত্যাদি।

শব্দ মাধ্যম (Sound Media) ঃ

রেডিও, রেকর্ড, টেপরেকডার প্রভৃতি।

গতি মাধ্যম (Motion Media) ঃ

চলচ্চিত্র, টি.ভি., ভি.ডি.ও. এবং স্লাইড।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই তিন মাধ্যম কখনো পরস্পরের পরিপূরক আবার কখনো একে অপরের প্রতিযোগী। পারস্পরিক এই সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আদতে পরিপুষ্ট হয় সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম ব্যবস্থা।

১০.৫ গণসংস্কৃতি

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও বিরাট ও জটিল হয়ে উঠছে তত বেশি করে মানুষ গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। আধুনিকযুগে গণমাধ্যমের প্রচার ও প্রভাব উর্দ্ধমুখী।

শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে জনসমাজে আধুনিকতার শুরু। তারপর যতদিন যায় ততই সমাজে রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজের যে চরিত্র লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই সমাজকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা চিহ্নিত করছেন 'গণ-সমাজ' বা Mass Society বলে। সংস্কৃতি (Culture) তারই এক স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় গণ-সমাজের নির্ধারক ভূমিকায় থাকে তার নিজস্বসংস্কৃতি।

সংস্কৃতি কিছু আচরণ ও বিশ্বাসের সমষ্টি। এই আচরণ ও বিশ্বাসই এক সমাজকে আরেক সমাজ থেকে আলাদা করে। এই আচরণ ও বিশ্বাস সমাজ বংশ পরম্পরায় তার পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যায়। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে রূপান্তরিত সংস্কৃতি সমস্ত সমাজেই জন্ম নিতে পারে। ফলে যে সমাজের দরজা যত বেশি খোলা, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের হার তত বেশি। এই সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া মানুষকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি সমাজ বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন গণসংস্কৃতির উৎপাদন ও ভোগ পৃথকীকৃত। যাঁরা এই সংস্কৃতির প্রযোজনা বা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তাঁরা নিজেরা তা ভোগ করেন না। গণসংস্কৃতি একান্তভাবেই দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য।

গণ-উৎপাদনের ফলে উৎপাদিত দ্রব্যে ভারসাম্য আনা হয়। এই ভারসাম্য আনা হয় ক্রেতা সাধারণের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য। এই চাহিদামূলক প্রকরণগুলির উপর নির্ভর করে দ্রব্যের মান ও প্রকৃতি।

এই সংস্কৃতিতে ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং জনগণের প্রশংসার উপর নির্ভর করে সাংস্কৃতিক সাফল্য।

গণসংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের ভাললাগাই জীবনের নৈতিক ও নান্দনিক মান বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষার লোকেরা থাকেন। এঁরা নানান উপসংস্কৃতির অন্তর্গত। ফলে গণসংস্কৃতি হল ব্যক্তির সেই সব ধ্যান ধারণা ও আচরণ যা এই সব উপসংস্কৃতিকে অতিক্রম করে চলে যায়। অর্থাৎ সমস্ত উপসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যাতে এই সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন।

গণসংস্কৃতির উদাহরণ ঃ

যে কোন গণপণ্য, যেমন টেলিভিশন, মোটরগাড়ি, ঘর সাজাবার আসবার পত্র। যে কোন গণ বিনোদন যথা ফুটবল, ক্রিকেট আধুনিক গান ইত্যাদি।

গণসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ঃ

সমাজতত্ত্ববিদরা গণসংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সে গুলি হল —

গণসংস্কৃতির প্রাথমিক শর্তই হল গণ-বিনোদন। ফলে জনসাধারণের সাধারণ রুচিকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৈরি হয় গণ-বিনোদন। আর যে জন্য সাধারণের দাবি ও প্রত্যাশা পূরণের সমস্ত কলা ও শিল্পকে নতুন করে সাজাতে হয়।

গণসমাজ গণজ্ঞাপন নির্ভর। গণসংস্কৃতির বাহকও তাই গণজ্ঞাপন।

গণবিনোদন গণমাধ্যমকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। সাধারণের রুচি অনুসারে গণমাধ্যমগুলি তাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে থাকে।

১০.৬ বিশ্বায়ণ ঃ তথ্যবিনোদন

'বিশ্বায়ণ' (Globalization) একটি নতুন ধারণা। আমাদের আধুনিক জীবন দিন দিন জড়িয়ে পড়ছে এই পরিভাষাটির সঙ্গে। কৃষি থেকে বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পড়ছে এর প্রভাব। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ব্যবহার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেছে এবং বিনা বাধায় তা করেন। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর নানা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সুযোগ লাভে বঞ্চিত। ফলে এই অবস্থায় রয়েছে দুটি শ্রেণী একদল তথ্যসমৃদ্ধ, যারা শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে সামর্থ্য এবং অন্যদল তথ্যের নাগালের বাইরে। প্রকৃতপক্ষে 'বিশ্বায়ণ' পশ্চিমী ধারণা থাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রকৃত বাস্তবতাকে। বিশ্বজুড়ে অভিন্ন বাণিজ্যিক বাজার গড়ার লক্ষ্যেই এটা করা হচ্ছে।

তথ্য-বিনোদন ঃ

'তথ্য' এবং 'বিনোদন' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তথ্য বিনোদন।

আমরা জানি তথ্যের বহু কাজ — জানানো, শিক্ষিত করা। বিনোদনও তথ্যের অন্যতম কাজ। আর এই

প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যমের বানিজ্যিকীকরণ থেকে এই প্রবণতা আসে। সমালোচকরা বলেন বিনোদনের উপকরণ হিসেবে তথ্যের পরিবেশন। ক্রেতা মনোরঞ্জনই মূল লক্ষে পর্যবসিত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, টেলিভিশন ছাড়াও বাণিজ্য সফল সংবাদপত্রগুলি বিনোদনমূলক বার্তা বা কথা তুলে ধরে বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়, বিশেষত, প্রান্তীক অবস্থানে থাকা মানুষদের কথা বিষয়বস্তু থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির বাস্তবতা থেকে যাচ্ছে আড়ালে। স্যাটেলাইটের হাত ধরে ঢুকে পড়ছে পশ্চিমী ধাঁচের নানা অনুষ্ঠান, উন্নয়নশীল দেশগুলির জীবনযাপনের সঙ্গে যার কোন মিল নেই। পশ্চিমী বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি চেষ্টা করছে একটা অভিন্ন বাণিজ্য বাজার তৈরি করতে। এইভাবে নেতিবাচক ভোগবাদের প্রসারে গণমাধ্যমগুলি সাহায্য করছে। তথ্য বিনোদন নীতি তথ্যের পণ্যায়ন ছাড়া কিছু নয়।

নতুন প্রযুক্তির প্রভাব ঃ

তথ্যবিনোদনের বড় মাধ্যম এখন ইন্টারনেট। বিশ্বের নানা প্রান্তের পোপগোষ্ঠী ঢুকে পড়েছে। ইন্টারনেটে সামর্থ্য থাকলে এই বিনোদন উপভোগ করতে পারে যে কেউ। 'নেট ফ্রেন্ড' আরেকটি বিনোদন উপকরণ।

তাছাড়া আজকাল বহু গায়ক, গায়িকা, অভিনেতা, অভিনেত্রী নিজেদের নামে ওয়েবসাইট খুলেছেন। সম্প্রতি বম্বের অভিনেতা শাহরুখ খান 'এস. আর. কে' ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন।

তবে ভারতে তথ্যবিনোদনের শুরু আশির দশক থেকে। গোড়ার পর্বে অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সম্প্রচার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ছিল দূরদর্শন। অনুষ্ঠান নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুম্বাই ফিল্মি জগতের বহু নামি দামি শিল্পী।

ভারতীয় দূরদর্শন তথ্য বিনোদন জগতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় — 'হামলোগ' (We People) এর হাত ধরে। স্বল্প সময়ের সিরিয়াল ভিত্তিক দেশীয় প্রোগ্রাম মারফত সুনিশ্চিত শ্রোতা দর্শক যেমন তৈরি করা যায়, তেমনি লাভের অঙ্কটাও কম নয় — এই বোধের জন্ম দেয় আমলোগ। এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রধান বিজ্ঞাপন দাতা 'ম্যাগি-টু-মিনিট নুডুলস্'। হামলোগ-এর হাত ধরে ওই ভোগ্যপণ্যটি শুধু বিশাল বাজার দখলই করেনি, ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসও প্রভাব ফেলেছে। বৃদ্ধি পেতে থাকে বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত দূরদর্শন অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই প্রবণতায় বিনোদন আর বিজ্ঞাপনদাতার বাণিজ্যিক সাফল্য প্রায় সমার্থক। বাণিজ্যিক সাফল্যই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তথ্যের পণ্যায়ন তার স্বাভাবিক পরিণতি।

বলা যেতে পারে 'হামলোগ' তথ্য বিনোদনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি গঠন করেছে। আর সেই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে তথ্য বিনোদনের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা আমরা লক্ষ্য করি। রামায়ণ, মহাভারত, দ্যা সোর্ড অব টিপু সুলতান, শ্রীকৃষ্ণ, জয়হনুমান, ওম্ নমঃ শিবায়ঃ — ইত্যাদি হিন্দুধর্ম কেন্দ্রিক মেগাসিরিয়ালের পাশাপাশি পারিবারিক সিরিয়াল শান্তি, হামরাহি, উদান তথ্যবিনোদনের বিশাল এক ক্রমপর্যায়। তথ্য এখানে গৌণ, বিনোদনই প্রধান।

একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না যে তথ্য বিনোদনের উপর ভর করে দূরদর্শন তার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আর এই জনপ্রিয়তার ভাগ বসিয়েছে দেশিবিদেশী উপগ্রহ চ্যানেলের পাশাপাশি সাম্প্রতিককালের কেবল্ টেলিভিশনও। দূরদর্শনের কাছে এই পরিস্থিতি এক বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাভাবিক কারণেরই বদলে যাচ্ছে তার অনুষ্ঠান বিন্যাস। পরিবর্তিত এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি তথ্য বিনোদনের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি।

১০.৭ সারাংশ

গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব ও প্রসারের ফলে লোকসংস্কৃতি তার গোষ্ঠীবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে মিশেছে বৃহত্তর জনসমাজে। গণসংস্কৃতি বা পণ্যায়ন সংস্কৃতি তার স্বাভাবিক পরিণতি। সাংস্কৃতির পণ্যায়ন যদি হয় ফল, গণমাধ্যমের প্রসার তার কারণ। ফলে জনসমাজের রুচি, পছন্দ আজ ক্রমশ বিনোদনমুখী। বাণিজ্যিক স্বার্থপূরণে তথ্যের চেয়ে বিনোদনের গুরুত্ব তাই দিনদিন বাড়ছে।